ইউনিট ৫

মহানবী (স)-এর মদীনা ইসলামী রাষ্ট্র

রাষ্ট্র ও সরকার মানব জীবনের দু'টি অপরিহার্য বিষয়। পৃথিবীতে মানুষের স্থিতি, বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্যে রাষ্ট্র ও সরকারের অস্তিত্ব একান্ত আবশ্যক। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, রাষ্ট্র ও সরকার ছাড়া চলতে পারে না এ বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক কালের মনীষীগণ প্রায় সকলেই একমত। তবে কোন ধরনের রাষ্ট্র ও সরকার মানুষের জন্যে সত্যিকারভাবে কল্যাণকর, সে বিষয়ে মনীষীদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে।

ইসলাম মানুষের জন্যে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা। রাষ্ট্র ও সরকার-এ জীবনব্যবস্থারই দু'টি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামের প্রধান উৎস আল-কুরআন মানুষকে শুধু কতিপয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত থাকে নি, বরং মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের জন্যও দিয়েছে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা। এই দিকনির্দেশনাতেই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠেছে দেশ-কাল-নির্বিশেষে মানুষের জন্যে কল্যাণকর এবং গতিশীল রাষ্ট্র ও সরকারের এক অনবদ্য চিত্র। ইসলাম-নির্দেশিত এই রাষ্ট্র ও সরকার কোন অবাস্তব কল্পনা-বিলাস নয়। বিশ্ববাসী এর বাস্তব নমুনা প্রত্যক্ষ করেছে সুদীর্ঘকাল ধরে। প্রকৃতপক্ষে এই রাষ্ট্র ও সরকারই যে মানব জাতির জন্যে অফুরন্ত আশীর্বাদ বয়ে আনতে সক্ষম। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তারও সাক্ষ্য-প্রমাণ লিপিবদ্ধ রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে।

আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগকে পরিশুদ্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা-সংগ্রাম করেছেন, যাতে আল্লাহর যমীনে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর আইন ও বিধান চালু এবং কার্যকর হয়। তাঁদের এই প্রাণান্তকর চেষ্টা সংগ্রাম ছিলো পূর্ণাংগ জীবনের সংশোধনের জন্য। আর রাষ্ট্র ছিল সেই সংশোধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কুরআন অধ্যয়ন থেকে জানা যায়, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, হযরত মুসা আলাহিস সালাম, হযরত দাউদ আলআহিস সালাম, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলন এবং তা আদর্শিক মানে পরিচালনা করেছিলেন। ওল্ড এবং নিউ টেস্টমেন্টের অধ্যয়ন থেকে এই সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, বনী ইসরাইলের অন্যান্য নবীগণও রাষ্ট্র সংস্থার সংশোধনের চেষ্টা করেছেন এবং ভ্রান্ত নেতৃত্বের অবাধ সমালোচনা করেছেন। ইসলামী চিন্তাধারায় রাষ্ট্র যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী থেকে অনুমান করা যায়। হযরত মুহাম্মদ (স.) যখন মক্কায় ইসলামের মিশন প্রচার করে নির্যাতিত হচ্ছিলেন তখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে শিখিয়ে দেয়া যে দোয়াটি পড়তেন তা হল-

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَاناً نَّصِيراً.

"বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে নিষ্ক্রান্ত করাও কল্যাণের সাথে এবং তোমার নিকট থেকে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি।" (সূরা বনী ইসরাইল : ৮০)

ইমাম হাসান আল-বসরী, কাতাদা, ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর আততাবারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, "প্রভু হয় আমাকেই রাষ্ট্র ক্ষমতা দান কর, আর না হয় অপর কোন রাষ্ট্রকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও, যেন আমি তার শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে পৃথিবীর এই মহাভাংগন ও বিপর্যয়কে সংশোধন করতে পারি, অশ্লীলতা ও নাফরমানীর এই মহাপ্লাবনকে প্রতিরোধ করতে পারি এবং তোমার সুষম আইন ও বিধানকে চালু ও কার্যকর করতে পারি।"

আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করতে, সঠিক প্রচার প্রসার ও প্রয়োগ করতে রাষ্ট্র শক্তির যে কোন বিকল্প নেই তা অনুধাবন করেই হযরত মুহাম্মদ (স.) হিজরত করে মদীনায় এসে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। মদীনা সনদ তার পরিকল্পনার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত বহন করে।

তিনি তার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলেন। মুখোমুখি হলেন বিরোধী শক্তির। তবুও দীর্ঘ সংগ্রামের পর মদীনা নামক ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠা করে তিনি সফল হলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের অনাবিল শান্তি ছড়িয়ে দিলেন গোটা বিশ্বে। যে কল্যাণকর রাষ্ট্রের নমুনা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এ ইউনিটে মহানবী (স.)-এর রাষ্ট্রব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ-

- ❖ পাঠ ঃ ১ মদীনা- ইসলামী রাষ্ট্র ও তার প্রশাসনিক কাঠামো
- ❖ পাঠ ঃ ২ মদীনা- সনদের গুরূত্ব
- ❖ পাঠ ঃ ৩ মদীনা- ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য
- ❖ পাঠ ঃ ৪ মদীনা- ইসলামী রাষ্ট্রের সচিবালয়
- ❖ পাঠ ঃ ৫ মদীনা- ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ
- ❖ পাঠ ঃ ৬ মদীনা- ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ

পাঠ ঃ ১ মদীনা- ইসলামী রাষ্ট্র ও তার প্রশাসনিক কাঠামো

এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ◆ মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন কিভাবে হয়েছিল তার বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ◆ রাসূল (স)-এর যুগে এ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো কেমন ছিল তা আলোচনা করতে পারবেন;
- ◆ মজলিসে শূরা কিভাবে আইন প্রণয়ন করত তা বলতে পারবেন;
- ◆ নির্বাহি বিভাগের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা কতটুকু তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ◆ বিচার বিভাগ কতটা কল্যাণকর ছিল তা উপস্থাপন করতে পারবেন।

রাসূল (স) নবুয়ত লাভের পর ইসলামের দাওয়াতের পাশাপাশি একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেন। তাঁর আদর্শের পক্ষে মানুষ তৈরির জন্য দাওয়াতী কার্যক্রম জোরদার করেন। তাই তো তখনকার রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী আবু জাহল ও আবু লাহাবদের বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত হন তিনি ও তাঁর সমর্থকরা। এক পর্যায়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন তাঁরা। তখনকার হাবশা সরকারের সহায়তা পেলেন বটে কিন্তু সেখানেও শান্তি পেলেন না মুসলমানগণ। অতপর তাঁরা মদীনায় হিজরত করলেন। পরিবেশ তৈরী হল মুসলমানদের পক্ষে। তাঁরা তাদের আদর্শকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে একটি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করলেন যার নাম "মদীনা ইসলামী রাষ্ট্র। ৬২৪ খৃষ্টাব্দের এ রাষ্ট্রটি বিশ্বের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো

বর্তমান দুনিয়ায় সাধারুত সকল রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো তিনটি বিভাগ নিয়ে গঠিত। এ তিনটি বিভাগের ভারসাম্যপূর্ণ সক্রিয়তা ও সমন্বয়ের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে একটি কল্যাণময় রাষ্ট্র।

প্রশাসনের এ তিনটি বিভাগেরই নিজস্ব দায়দায়িত্ব, ক্ষমতা ও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

বিভাগ তিনটি হচ্ছে-

১. আইন বিভাগ
২. নির্বাহী বিভাগ এবং
৩. বিচার বিভাগ

এ ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো শুধু আধুনিক রাষ্ট্রের বর্তমান আছে তা নয় বরং এখন থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে রাসূল (স) মদীনা নামক যে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন তারও প্রশাসনিক কাঠামো অনুরূপই ছিল।

পার্থক্য এতটুকু যে, বর্তমান কালে রাষ্ট্রের উল্লিখিত বিভাগগুলোর কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সুস্পষ্টভাবেই পৃথক করা হয়েছে, কিন্তু মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের উল্লেখিত কাঠামোর কার্যক্রম আধুনিক রাষ্ট্রের মত সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ছিল না।

মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রে বিরাজমান তিনটি বিভাগেরই প্রধান ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। তিনি প্রত্যেক বিভাগের জন্য প্রধান দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন নি। তবে যখনই যাকে যে কাজের জন্য উপযুক্ত মনে করেছেন তাকে তৎক্ষণাৎ দায়িত্ব প্রদান করে প্রশাসনের তিনটি বিভাগেরই কাজ সম্পাদন করতেন।

আইন প্রণয়ন বিভাগ

ইসলামে আইনদাতা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। সে আইন তাঁরই মনোনীত প্রতিনিধি ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। তিনি যে আইন নিজে পালন করেছেন তা জনগণকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশ, অনুমতি ও শিক্ষানুযায়ী উপবিধি (By-laws) তৈরি করেছেন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তা কার্যকর করেছেন এবং তা জনগণের উপর জারি করেছেন। কাজেই মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের (Legislation) আলাদা কোন

ধারণা ছিল না। আল্লাহর দেয়া আইনকে রাসূলে করীম (স) সূক্ষ্ম অধ্যয়ন, অনুধাবন, গবেষণা করে সমাজে ও পরিবেশে বাস্তবায়ন করেছেন।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মানুষই মানুষের জন্য আইন রচনা করে। আইন রচনার জন্য যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়, তা পার্লামেন্ট (Parliament) নামে পরিচিত।

রাসূল (স.) মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের জরুরী বিষয় যে ব্যাপারে আল্লাহর সরাসরি নির্দেশনা নেই- সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। তাঁর একটি পরামর্শ সভা ছিল। একেই আরবীতে বলে "মজলিসে শূরা।"

রাসূল (স.) বিভিন্ন জরুরী মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য দূরদর্শী জ্ঞান সম্পন্ন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক যুদ্ধসহ বিভিন্ন অভিযান পরিচালনার পূর্বে করণীয় সম্পর্কে সাহাবীদের সাথে পরমর্শ করতেন।

হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, যায়দ ইবন সাবিতসহ প্রখ্যাত সাহাবিগণ তাকে পরামর্শ দিতেন। এছাড়া কখনও কখনও আনসার মুহাজিরদের সাধারণ অধিবেশনেও তিনি পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

মজলিসে শূরা গঠন

মুসলমানদের দেশ ও জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে সকল বিষয়ে আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই সে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পরামর্শ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (স.)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ

"এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৫৯)
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে।" (সূরা আশ-শূরা : ৩৮)

নির্বাহী বিভাগ

নির্বাহী বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের ঐ বিভাগকে বুঝায় যে বিভাগ মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্টে কর্তৃক রচিত ও স্বীকৃত আইনকে দেশের সর্বত্র কার্যকর করে থাকে।

আধুনিক নিয়মে মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্টে ধারাবদ্ধ আইন পাস হয়ে যাওয়ার পর তাতে রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর হতে হয় অন্যথায় তা 'আইন' হিসেবে গণ্য হয় না। নির্বাহী বিভাগ বা আইন-প্রয়োগকারী "অথোরিটি' (Authority) আধুনিক কালের প্রত্যেকটি সরকারের একটি অপরিহার্য এবং সম্ভবত সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ।

বর্তমান কালের প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার হলে প্রেসিডেন্ট ও তার মন্ত্রীসভা (Cabinet) আর পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার হলে প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীদের সমন্বয়েই এ নির্বাহী বিভাগ গঠিত হয়।

রাসূল (স.)-এর শাসন আমলে বর্তমান কালের মত বিভাজনকৃত নির্বাহী বিভাগ ছিল না। তবে কুরআন-সুন্নাহর আইন দেশের সর্বত্র বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে দায়িত্ব প্রদান করতেন। তারা বিধানগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করতেন।

নির্বাহী বিভাগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বস্তুত কুরআন ও সুন্নাহ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক ও ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবভাবে প্রয়োগ ও অনুসরণের জন্য। মজলিসে শূরা এ দু'টি উৎস থেকে চিন্তা-গবেষণা এবং আলোচনা পর্যালোচনা করে আইনসমূহ ধারাবদ্ধ করে দেন। যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি বিভাগকে অবশ্যই দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর তা হল নির্বাহী বিভাগ।

আইনকে অন্ধ নির্বিচারে রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে শুধু জারি করাই তো একমাত্র কাজ নয়, ইসলামের দিক দিয়ে আসল লক্ষ্য হচ্ছে, সে আইনের ভিত্তিতে ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবার গঠন এবং লালন। সে জন্য পূর্ণ সতর্কতা, ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। তাহলেই সে রকম আদর্শ ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ গড়ে উঠতে পারে, যা গড়ার জন্য পৃথিবীতে ইসলামের আগমন ঘটেছে।

আল্লাহর আইন জারি ও যথাযথভাবে কার্যকর করার ব্যাপারে কোনরূপ অনীহা বা দুর্বলতা প্রদর্শন করা যাবে না বরং এ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক যন্ত্রকে অত্যন্ত শক্ত ও অনমনীয় হতে হবে।

প্রশাসনিক দুর্বলতা গোটা রাষ্ট্রকেই দুর্বল করে। জনগণের মনে রাষ্ট্র শক্তির প্রতি আনুগত্যমূলক ভাবধারা নিঃশেষ করে দেয়। এ কারণে আল্লাহর আইন জারি ও কার্যকর করার ব্যাপারে একবিন্দু দুর্বলতা কিংবা দয়া-সহানুভূমি প্রদর্শন তো দূরের কথা, তার উদ্রেক হওয়াও কুরআনের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। ব্যভিচারীদ্বয়ের দন্ড কার্যকর প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ

"আল্লাহর বিধান কার্যকরকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও।" (সূরা আন-নূর : ২)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রশাসনিক শক্তিকে আল্লাহর আইন জারি করতে হবে এবং আল্লাহর আইন জারি ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন রূপ দয়া প্রদর্শন করা যাবে না। দয়ার উদ্রেক হওয়া ঈমানের পরিপন্থী। দয়া দেখানো হলে প্রমাণিত হবে যে, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান নেই।

প্রশাসনিক কর্মদক্ষতার প্রতীক ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স)। তিনি যেমন আল্লাহর আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনরূপ দুর্বলতা দেখান নি, এ সম্পর্কে তিনি কোনরূপ সুপারিশ স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেছেন। শুধু অস্বীকার নয়, আল্লাহর আইন জারি করার ব্যাপারে সুপারিশের কথা শুনে তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন।

মাখযূমী বংশের একটি মেয়েলোক চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়। রাসূলে করীম (স)-এর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র উসামা ইবনে যায়দ (রা)-তাঁর নিকট দন্ডাদেশ মওকুফ করার ব্যাপারে সুপারিশ করার ইচ্ছা করেছিলেন। নবী করীম (স) তাঁর কথা শুনে অত্যন্ত ধমকের সুরে বলেন ঃ

أتشفع فى حد من حدود الله ؟

"আল্লাহ ঘোষিত একটি দন্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে তুমি সুপারিশ করছ ?"
অতঃপর তিনি মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেনঃ

أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا و إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد

"হে জনগণ ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে শুধু এ কারণে যে, তাদের মধ্য থেকে কোন অভিজাত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে তারা অব্যাহতি দিত। আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর দন্ড কার্যকর করতো।" (মুসলিম)

আল্লাহর আইন-বিধান প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সমাজের উপর কার্যকর করতে হবে। 'হদ্দ' দন্ডসমূহ জারি করতে হবে। এ কাজ যেমন একান্ত জরুরী, তেমনি তা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই-নির্বাহী শক্তির সাহায্যেই আঞ্জাম দিতে হবে। এ কাজের দায়িত্ব তো আর সাধারু মানুষের উপর ছেড়ে দেয়া যায় না, সাধারু মানুষকে কোন প্রকারেই আইন হাতে তুলে নেয়ার সুযোগ দেয়া যায় না। অন্যথায় চরম অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়া অবধারিত। মানুষের উপর নির্বিচারে জুলুম হওয়া, মানুষের মর্যাদা বিনষ্ট হওয়া এবং মানুষের মানবিক অধিকারও হরু হওয়া নিশ্চিত। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও নির্বাহী সংস্থা এ জন্যই একটি অপরিহার্য বিভাগ। এই বিভাগটিই হবে এ কাজের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তৃত্বশীল।

রাসূলে করীম (স)-এর যুগে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

রাসূলে করীম (স) যখনই কোন সাহাবীকে কোন অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে পাঠাতেন, তখনই তাকে ইসলামী আদর্শানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা ও অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতেন।

নবী করীম (স.) হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কর্মস্থলে যাওয়ার পূর্বেই দীর্ঘ ভাষণের মাধ্যমে তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেন।

রাসূলে করীম (স) তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে যাঁকে যে কাজের যোগ্য মনে করতেন, তাঁকে সেই কাজে নিয়োগ করতেন এবং সেই কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ও দিতেন। আর শুধু নিয়োগপত্র দিয়েই তাঁকে পাঠিয়ে দিতেন না, তাঁকে কাজ সম্পর্কে পূর্ণ প্রশিক্ষণও দিতেন। তাঁর কাজের প্রকৃতি কি, কি মনোভাব নিয়ে কাজ আঞ্জাম দিতে হবে, কি নিয়ম-নীতি তাঁকে মেনে চলতে হবে, জনগণের সাথে তাঁকে কিরূপ আচরু করতে হবে, সব কথা-ই তিনি তাঁকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতেন। আর এ ভাবেই তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সমগ্র ইসলামী রাজ্যে একটি সুসংঘবদ্ধ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন।

তিনি ডাক যোগাযোগ রক্ষার জন্যও দায়িত্বশীল কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। তখনকার সময় চিঠি-পত্রের আদান প্রদান সাধারুত সরকারী পর্যায়েই হতো এবং লোক মারফত সে পত্রাদি প্রেরু করা হতো। এই কারণে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

إذا أبردتم إلى بريد فأبردوه حسن الوجه حسن الاسم

"তোমরা যখন আমার নিকট কোন পত্রবাহক পাঠাবে, তখন তোমরা অবশ্যই ভাল চেহারার ও ভাল নামের ব্যক্তিকে পাঠাবে।"

আর এই সবের মাধ্যমেই তখনকার সময় প্রয়োজন উপযোগী এক পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ গড়ে তোলা হয়েছিল এবং তার দ্বারা যাবতীয় সরকারী সিদ্ধান্ত ও আদেশ-ফরমান কার্যকর করা হতো।

প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত লোকদের জরুরী গুণাবলী

বস্তুত প্রশাসনিক বিভাগ-ই রাষ্ট্রের প্রকৃত আদর্শ, রীতি-নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করার প্রধান মাধ্যম। এই বিভাগের পূর্ণ দক্ষতা ও কার্যকারিতার উপর শুধু যে রাষ্ট্রীয় আদর্শের যথার্থ বাস্তবায়ন নির্ভরশীল তা-ই নয়, রাষ্ট্রের সাফল্য স্থিতিও এরই উপর নির্ভর করে। কেননা জনগণকে সঠিক পথে পরিচালনা, আদর্শের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোন বিচ্যুতি দেখা গেলে তা থেকে তাদের বিরত রাখা এবং তাদের সংশোধন ইত্যাদি যাবতীয় কাজ প্রশাসনিক বিভাগকেই আঞ্জাম দিতে হয়। গোটা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা (Law and order) রক্ষা করা ও জনগণের অধিকার আদায় করা এই বিভাগেরই কর্তব্য। এই বিভাগের যাবতীয় কাজ যথার্থভাবে পরিচালিত হওয়া এই বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল ছিলো।

নিম্নে কতিপয় প্রয়োজনীয় গুণের উল্লেখ করা হলো-

দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতা

যে লোককে যে কাজে নিয়োগ করা হবে বা যে লোকের উপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পিত হবে, সে কাজটি নিখুঁতভাবে করার যোগ্যতা রাখতে হবে, তা না হলে সবকিছুই নিষ্ফল হয়ে যাওয়া অবধারিত। মহান আল্লাহ বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন-

فَٱسْأَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعْلَمُونَ

"তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস কর।" (সূরা আন-নাহল : ৪৩)
এ নির্দেশে প্রত্যেক ব্যাপারে দক্ষ-অভিজ্ঞ লোকদের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয় জ্ঞান লাভের উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন ঃ

إن الرياسة لا تصلح إلا لأهلها

"কোন কাজের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব কেবল সেই ব্যক্তির জন্যই শোভা পায়, যে তার যোগ্যতা রাখে।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح

"যে লোক না জেনে কাজ করে সে ভাল করার তুলনা বেশী বিনষ্ট করে।"

বিশ্বস্ততা ও নিভৃরযোগ্যতা

কর্মের যোগ্যতা-দক্ষতার পর প্রয়োজনীয় বিশেষ গুণ হচ্ছে বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা সরকারী দায়িত্বশীলের অবশ্যই আমানতদার হতে হবে। কেননা সরকারী পর্যায়ে যত সমস্যা ও জন-জীবনে যত দুঃখ দুর্দশা তার অধিকাংশটাই হয়ে থাকে অবিশ্বস্ততা, অ-নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতা এবং আমানতের খিয়ানত করার কারণে। এ জন্যই নবী (স.) বলেছেন-

إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة

"আমানতদারী বিনষ্ট হলে কিয়ামত তথা ধ্বংসের অপেক্ষা কর।" (বুখারী),
মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلأَمِينُ

"তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।" (সূর আল-কাসাস : ২৬)

অন্যায় ও দুর্নীতি পরিহার

যে লোক বৈষয়িক সুখ-শান্তি অন্যায়ভাবে লাভ করার প্রতি আগ্রহী নয়, যে লোক অল্প পেলেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। যে সৎ ও চরিত্রবান, সরকারী ও প্রশাসনিক দায়িত্বে এই গুণের লোকদের নিয়োগ করা হলে প্রশাসনিক যন্ত্রে কোনরূপ সমস্যা প্রবেশ করতে পারে না। সে পদাধিকারের সুযোগে দুর্নীতির মাধ্যমে যেমন অর্থোপার্জন করতে সচেষ্ট হবে না, তেমনি কোন অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করা থেকেও পূর্ণ সতর্কতার সাথে দূরে সরে থাকেব। তার দ্বারা যেমন সরকারের কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না, তেমনি জনগণের অধিকার হরণের মত কোন কাজ হওয়ার সম্ভাবনাও নিঃশেষ হয়ে যাবে । এ পর্যায়ে হযরত আলী (রা)-এর এ কথাটি অধিক গুরুত্বপূর্ণঃ

إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا معيشتهم على قدر ضعف الناس

''ন্যায়বাদী রাষ্ট্র নেতাদের জন্য আল্লাহ ফরয করে দিয়েছেন যে, তারা যেন জনগণের দুর্বলতা অনুপাতে নিজেদের জীবিকার পরিমাণ নির্ধারু করে।''

শুধু তা-ই নয়, সরকারী দায়িত্বশীল লোকদের উচ্চতর ও পবিত্রতম নৈতিক চরিত্রের গুণে ভূষিত হওয়াও আবশ্যক। তার মধ্যে ধৈর্য ও সহনশীলতাও থাকতে হবে। সম্পদের প্রতি হতে হবে নির্মোহ। পুরোপুরি ইসলামী আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হতে হবে এবং মহৎ গুণের অধিকারী হবে।

বিচার বিভাগ

বিচার কার্য ও জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করা দ্বীন-ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তা মানবতার সেবায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কেননা এ কাজটি সুষ্ঠুষ্ঠরূপে সুসম্পন্ন হওয়ার উপরই গোটা সমাজের নিরাপত্তা, সমাজের লোকদের জীবনে শান্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। বস্তুত যে সমাজে বিচার নেই, জনগণের ফরিয়াদ পেশ করার কোন স্থান নেই এবং তার প্রতিকার করারও কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই, তা বন্য সমাজ হতে পারে, পাশবিক সমাজ হতে পারে, তা কখনই মানুষের বাসোপযোগী সমাজ হতে পারে না।

এ দৃষ্টিতে বিশ্বের ইতিহাসে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, রাসূল (স.)-এর বিচার ব্যবস্থা ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও তুলনাহীন।

যেখানে শুধু নামে মাত্র বিচার ছিল না, ছিল সর্বতোভাবে ন্যায়সঙ্গত নিরপেক্ষ ও আদর্শ ভিত্তিক সুবিচার। এ সুবিচার ও ইনসাফ তখনকার সমাজের মানুষকে পূর্ণ মানবীয় মর্যাদা নিয়ে নির্বিঘ্নে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছিল। দিয়েছিল পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা। প্রতিষ্ঠিত করেছিল স্থিতিশীলতা। প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করেছিল তার মানবীয় অধিকার ও মর্যাদা, তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। পরিণামে গোটা সমাজই হয়ে উঠেছিল সর্বদিক দিয়ে পুরোপুরিভাবে ভারসাম্যপূর্ণ।

বিচারের সাথে সুবিচারের সম্পর্ক গভীর ও ওতপ্রোত। বিচার যদি শুধু বিচার না হয়ে পরিপূর্ণ সুবিচার হয়, তাহলেই সমগ্র সমাজ হতে পারে ন্যায়পরায়ণতায় পরিপূর্ণ। সমাজকে ভরে দিতে পারে অভিনব শান্তি-শৃঙ্খলা, সাহসিকতা ও কর্মোদ্দীপনা। মানুষ তখন তার নিজের প্রাণ, ধন-সম্পদ ও ইযযত-আবরুর দিক দিয়ে হতে পারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। আর তার ফলে গোটা রাষ্ট্রই হতে পারে সমৃদ্ধশালী ও কল্যাণময়। কিন্তু তা যদি না হয়, যদি বিচারের নামে চলে জুলুম-শোষণ-নির্যাতন, সুবিচার বলতে কোথাও কিছু খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে চতুর্দিকে অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, মারামারি, অপহরু, ছিনতাই, হত্যা, নারী ধর্ষণ, বলাৎকার ও চুরি-ডাকাতি-লুণ্ঠন দেখা দেয়া অবধারিত। সমগ্র সমাজটাই হয় চরমভাবে বিপর্যস্ত। আর তার ফলে রাষ্ট্র তার সমস্ত মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। শাসনকার্য সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত ও বিঘ্নিত হয়ে পড়ে, সার্বভৌমত্ব হয়ে পড়ে বিপন্ন। তাই রাসূল (স.)-এর বিচার বিভাগ ছিল সুবিচারপূর্ণ। তিনি এমনই একটি বিচার বিভাগের নমুনা বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছিলেন।

বিচারকের যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা

বিচার বিভাগ সমাজে তার গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যদি বিচারকের প্রকৃত যোগ্যতা-কর্মক্ষমতা থাকে। তাঁর মধ্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকে। বিচারকার্যের যোগ্যতার জন্য জরুরী শর্তসমূহ তার মধ্যে পুরাপুরি পাওয়া যায়।

ইসলাম বিচারকের কতিপয় গুণ ও শর্তের উল্লেখ করেছে। বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে ইসলাম-ই সর্ব প্রথম এসব গুণ ও শর্তের উল্লেখ করেছে।

নিম্নে এগুণগুলো বর্ণনা করা হল।
১. ঈমানদার হওয়া
২. পূর্ণবয়স্ক হওয়া
৩. বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা
৪. ন্যায়নিষ্ঠতা ও পক্ষপাতহীনতা
৫. আইন সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান ও বিচক্ষণতা
৬. তীক্ষ্ম স্মরুশক্তি, মেধা ও প্রতিভা সম্পন্ন হওয়া

কেননা বিচারক বিস্মৃতির শিকার হলে তার দ্বারা সঠিকভাবে বিচার কার্য সম্পাদন হতে পারে না।

রাসূলে করীম (স.) বিচারকের মর্যাদা ও তার দায়িত্বের জবাবদিহিতা সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

القضاة ثلثة واحد فى الجنة واثنان فى النار فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق وقضى به و رجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى النار و رجل قضى للناس على جهله فهو فى النار

“বিচারকরা তিন ধরনের হয়। এক ধরনের বিচারক জান্নাতে যাবে, আর অপর দুই ধরনের বিচারক জাহান্নামে যাবে। জান্নাতে যাবে সেই বিচারক, যে প্রকৃত সত্য অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বিচার করেছে। পক্ষান্তরে যে বিচারক প্রকৃত সত্য জানতে ও বুঝতে পেরেও রায়দানে জুলুম করেছে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে বিচারকে অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও লোকদের উপর বিচার চাপিয়ে দিয়েছে সেও জাহান্নামে যাবে।”

এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম জাফর সাদেক (র) বলেছেন ঃ চার ধরনের বিচারক দেখা যায়। তন্মধ্যে তিন ধরনের বিচারকই জাহান্নামে যাবে, আর মাত্র এক ধরনের বিচারক জান্নাতে যাবে। যে ব্যক্তি সজ্ঞানে অবিচার করে সে জাহান্নামে যাবে। যে ব্যক্তি না জেনে অবিচার করে সেও জাহান্নামে যাবে। যে ব্যক্তি না জেনেও সঠিক বিচার করে, সেও জাহান্নামে যাবে। আর যে জেনে-বুঝে সুবিচার করে, কেবল সে-ই জান্নাতে যাবে।

বিচারককে ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ

"তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার কার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।" (সূরা আন-নিসা : ৫৮)

বিচারককে পক্ষপাতহীন হতে হবে। বিচারের রায় যদি নিজের আপনজনদের বিরুদ্ধেও যায় তাহলেও ন্যায় বিচার করতে হবে। মহানবী (স) এ ব্যাপারে বলেন-

"ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যদিও নিজের বিপক্ষে যাক না কেন।" (বুখারী)

সারসংক্ষেপ

ইসলামের ইতিহাসে মদীনা ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম রাষ্ট্র। আধুনিক কালের রাষ্ট্রসমূহে, বিধি-বিধান প্রণয়ন, তার বাস্তবায়ন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার যে সকল কার্যক্রম পারিচালিত হচ্ছে রাসূল (স.)-এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে ও সকল বিভাগের সঠিক বাস্তবায়ন ছিল। পার্থক্য এটতুকু যে, তখন বিভাগগুলোকে পৃথক করা হয়নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. কয়টি বিভাগের সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হয় ?

ক. ২টি; খ. ৩টি;
গ. ৪টি; ঘ. ৫টি।

২. আইন প্রণয়নের কাজ রাষ্ট্রের কোন বিভাগ পালন করে ?

ক. বিচার বিভাগ; খ. নির্বাহী বিভাগ;
গ. আইন বিভাগ; ঘ. পুলিশ বিভাগ।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন করে তার নাম কি ?

ক. পার্লামেন্ট; খ. মজলিসে শূরা;
গ. সংসদ; ঘ. নিরাপত্তা বিভাগ।

৪. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের আইনের মূল প্রণেতা কে ছিলেন ?

ক. আল্লাহ; খ. রাসূল (সা.);
গ. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) ঘ. আবু বকর (রাঃ)।

৫. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন ?

ক. হযরত আবু বকর (রা); খ. স্বয়ং রাসূল (স);
গ. হযরত আবু উবায়দা (রা); ঘ. হযরত মায়াজ (রা)।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. একটি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো কয়টি ও কী কী ? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. মজলিসে শূরা কী ? তার কাজ কী লিখুন।
৩. শূরা গঠনে আল্লহর নির্দেশ কী ? বর্ণনা করুন।
৪. রাসূল (স.) কীভাবে প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ দিতেন ? আলোচনা করুন।
৫. রাসূল (স.)-এর বিচার বিভাগ কেমন ছিল ? লিখুন।

বিষদ উত্তর-প্রশ্ন

১. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের প্রয়োজনীয়াতা ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ২

মদীনা সনদের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ◆ মদীনা সনদের পরিচয় বলতে পারবেন।
- ◆ মদীনা সনদের মৌলিক ধারাগুলো আলোচনা করতে পারবেন।
- ◆ মদীনা সনদ কিভাবে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের মর্যাদা পেতে পারে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ◆ সনদের বিভিন্ন মুখী গুরুত্ব বলতে পারবেন।

পূর্বের পাঠে মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামোর তিনটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ পাঠে আমরা মদীনা সনদ সম্পর্কে আলোকপাত করব। এ সনদ মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করে। নিম্নে এ সনদের পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

মদীনা সনদ

রাসূল (স.) আল্লাহর নির্দেশে নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে মদীনাবাসীর আহবানে সেখানে হিজরত করেন। মদীনায় এসে তিনি দেখলেন তথায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করছে। ১. মূর্তিপূজক সম্প্রদায়, ২. ইয়াহূদী সম্প্রদায়, ৩. খ্রিষ্টান সম্প্রদায় এবং ৪. মুসলিম সম্প্রদায়। এদের মাঝে একদিকে ছিল আদর্শিক অমিল আর অন্যদিকে ছিল পরস্পর বিরোধ ও বিবাদ।

মহানবী (স.) দেখলেন, যদি মদীনার পরিবেশ এমনিভাবে বিরাজিত থাকে তবে যে আদর্শের বিস্তারের জন্য তিনি নিজের জন্মস্থানের মায়া পরিত্যাগ করেছেন তা সফল হবে না। তিনি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেন মদীনাবাসীর মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি না থাকলে মদীনার কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়। তাঁদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও একাত্মবোধের উদ্রেক না করা পর্যন্ত মঙ্গল বয়ে আসবে না। আর ইসলামী দাওয়াতের প্রসার এবং তার জন্য শক্তিশালী একটি পরিবেশও তৈরি করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি মদীনার সকল আদর্শের নাগরিকের মাঝে একটা ঐক্যের বন্ধন তৈরী করতে উদ্যোগী হলেন।

তিনি সকল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ডাকলেন। তাদের নিয়ে তিনি আন্তঃসাম্প্রদায়িক বৈঠক করলেন এবং ঐক্য ও সম্প্রীতির আবশ্যকতা বুঝালেন। এরপর তিনি একটি সনদ প্রস্তুত করলেন। যাতে সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য লিপিবদ্ধ করা হল। সকল আদর্শের লোকজন সেই সনদের বক্তব্য মেনে নিয়ে স্বাক্ষর করলেন। ইসলামের ইতিহাসে এই সনদের নাম হচ্ছে 'মদীনার সনদ'।

মদীনা সনদের ধারাসমূহ

মদীনা সনদে যে সকল ধারা স্থান পেয়েছিল তার কোনটি মুসলমানদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল আবার কোনটি মদীনার ইয়াহূদী কিংবা পৌত্তলিকদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এসব ধারার মূল টার্গেট ছিল মদীনায় শান্তি ও স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতে মদীনা সনদে মোট ৫০টি বিধান লিপিবদ্ধ করা হয়। নিম্নে সনদের গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো ধারা উল্লেখ করা হল।

১. মদীনা সনদে স্বাক্ষরকারী ইয়াহূদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমান সম্প্রদায়সমূহ সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং তারা সবাই একটি সাধারু জাতি বা উম্মাহ হিসেবে গণ্য হবে।

২. হযরত মুহাম্মদ (স.) নবগঠিত প্রজাতন্ত্রের প্রধান হবেন এবং পদাধিকার বলে তিনি মদীনার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্বময় কর্তা হবেন।

৩. পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে। মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায় বিনা দ্বিধায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

৪. কেউ কুরায়শদের সাথে সন্ধি স্থাপন বা মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কুরায়শদেরকে সাহায্য করতে পারবে না।

৫. স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায়কে বহিঃশত্রু আক্রমণ করলে সকল সম্প্রদায় সমবেতভাবে তা প্রতিহত করবে।

৬. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবেই গণ্য হবে। এর জন্য অপরাধী সম্প্রদায়কে দোষী করা চলবে না।
৭. মদীনা শহরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হল এবং রক্তপাত, হত্যা, বলাৎকার ও অপরাপর অপরাধমূলক কার্যকলাপ একেবারেই নিষিদ্ধ করা হল।
৮. ইয়াহূদীদের মিত্ররাও সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে।
৯. মহানবী (স) -এর পূর্বানুমতি ব্যতীত মদীনাবাসীগণ কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।
১০. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে হযরত (স.) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তার মীমাংসা করবেন।
১১. সনদের শর্ত ভঙ্গকারীর উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হবে বলে লিপিবদ্ধ হয়।
১২. যিনি মদীনায় প্রবেশ করবেন নিরাপদে থাকবেন, যিনিই মদীনা থেকে বের হবেন তিনিও নিরাপদে থাকবেন, তবে যে ব্যক্তি অত্যাচারী ও অন্যায়কারী সে নিরাপদ নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আশ্রয় দেন যিনি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেন।
১৩. সনদে স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কেউ যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে মুসলমান ও ইয়াহূদীরা পরস্পরের সহযোগী হবে এবং নিজেদের ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করবে, তারা মিলে নির্যাতিতদের সহায়তা করবে।

মদীনা সনদের গুরুত্ব

রাসূল (স.)-এর পূর্বেও এ পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ ছিল, বিভিন্ন রাষ্ট্র ছিল। তবে সে সব রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল অপরিকল্পিত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। মদীনা সনদ প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন সেটি ছিল অনন্য, অত্যন্ত সুশৃংখল ও পরিকল্পিত, কারু এ ধরনের একটি সুন্দর পদক্ষেপ ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে। বিভিন্ন দিক বিচারে মদীনা সনদের অপরিসীম গুরুত্ব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। নিম্নে মদীনা সনদের গুরুত্বগুলো বর্ণিত হল।

বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান

ক. বিশ্বের ইতিহাসে 'মদীনা সনদ'ই প্রথম লিখিত সংবিধান। এর পূর্বে রচিত ছিল ব্যবহারিক কিছু বিচ্ছিন্ন আইন ও উপদেশ যা সংবিধান হিসেবে গণ্য নয়। তাই ওয়েল হাউজেন, স্প্রেংগার, মুথেলার, গ্রীস, লেভী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এর নতুনত্ব অনুধাবন করেছেন। মদীনা সনদের ন্যায় পৃথিবীর কোন শাসনতন্ত্রই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কর্তৃক নিঃসৃত এবং স্বীকৃত শাসনতন্ত্রের মর্যাদা পায়নি।

নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের অনন্য দৃষ্টান্ত

যে কোন দেশে বিভিন্ন মতাদর্শের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাসবাস করে থাকে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রে দেখা যায়, রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায় পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ না হতে পারায় তাদের মধ্যে সংঘাত, কলহ ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু লোককে প্রাণ দিতে হয়। মদীনায় সনদ প্রমাণ করে যে, একই রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ের সকল ধর্মের জনসাধারণের নাগারিক অধিকার সমানভাবে স্বীকৃত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। সনদের একটি ধারায় বলা হয়েছে সনদে স্বাক্ষরকারী ইয়াহূদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমান সম্প্রদায়সমূহ সকল নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং একটি সাধারু জাতি গঠন করবে। রাসূল (সা.) সনদের এ ধারার আলোকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করেছিলেন। তাই একথা প্রমাণিত যে, একটি ঐক্যবদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনে মদীনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম।

রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা

কোন এলাকার বা দেশের স্থিতিশিলতা ও শান্তিময় পরিবেশের জন্য সেখানকার রাজনৈতিক ঐক্য খুবই জরুরী। রাসূল (স.) মদীনায় গিয়ে এ দিকটি উপলব্ধি করলেন এবং মদীনা সনদে রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করলেন। তাই তিনি সনদের একটি ধারায় উল্লেখ করেছেন যে, সকল সম্প্রদায় মিলে একটি সাধারু জাতি বা উম্মাহ গঠন করবে। রাসূল (স.) এতে সফল হলেন এবং শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন।

নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা

মহানবী (স) এর মদীনায় গমনের পূর্বে মদীনার সমাজে যত নাগরিক বসবাস করত তারা সবাই সমান অধিকার ভোগ করতে পারত না। সেখানে উচ্চ শ্রেণীর নাগরিকের সাথে এক ধরনের আচরু করা হত আর নিম্ন ও গরীব শ্রেণীর নাগরিকের সাথে ভিন্ন ধরনের আচরু করা হত। এ ধরনের বৈষম্যের ফলে অপরাধ প্রবনতা বেড়ে যায়, তাই সমাজের কল্যাণে রাসূল (স.) সনদে এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলেন। তিনি সনদের একটি ধারায় উল্লেখ করলেন যে, সনদে স্বাক্ষরকারী ইয়াহূদী, খৃস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমানসহ সকল সম্প্রদায় সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে, কারও প্রতি কেউ বৈষম্য মূলক আচারু করতে পারবে না। সনদের এ ধারাটি আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের জন্য একটি অনন্য মডেল হিসেবে স্বীকৃত।

ধর্মীয় উদারতার দৃষ্টান্ত

মদীনার সনদটি ধর্মীয় উদারতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। কল্যাণময় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ গঠন অত্যন্ত জরুরী। রাসূল (স.) উক্ত সনদের মধ্য দিয়ে এ কাজটি বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন। এ সনদ প্রমাণ করে যে, ধর্মীয় বাড়াবাড়ি মোটেই কল্যাণকর নয়। স্বাধীনভাবে প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন

মদীনা সনদের দ্বারা এই প্রথম তৎকালিন আরব দেশে একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। গোত্রতান্ত্রিকতার অবসান ঘটায়। অরাজকতা, বিশৃংখলার পরিবর্তে মহানবী (স.) 'এক শাসক, এক আইন' এ নীতি প্রবর্তন করেন। হিট্টি বলেন, "মদীনা প্রজাতন্ত্রই পরবর্তীকালে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল স্থাপন করে।"

ইসলাম প্রচারের সুযোগ

যে কোন আদর্শ প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রয়োজন অনুকুল পরিবেশ। রাসূল (স.) ইসলামী আদর্শ প্রচার ও প্রসারে ব্যাকুল ছিলেন কিন্তু তিনি ইতিপূর্বে কখনো ইসলাম প্রচারের অনুকুল পরিবেশ পান নি। মদীনা সনদ প্রনয়নের পর তিনি ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ ফিরে পেলেন। সনদের ফলে যখন প্রতিটি নাগরিক একে অপরের সহযোগী হয়ে পড়ল তখন দ্বন্দ সংঘাতের অবসান ঘটল। রাসূল (স.) সুযোগটি কাজে লাগিয়ে নিশ্চিন্তে ইসলামের প্রচার করতে সক্ষম হলেন। মদীনার সর্বত্র ইসলামের বাণী প্রচারের সুযোগ হল।

বৈপ্লবিক পরিবর্তন

এ সনদ একান্তভাবেই এক নতুন বিপ্লব আনয়ন করে। আমেরিকার স্বাধীনতা যোঘণা, ফরাসি বিপ্লব ও জাতিসংঘের মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্র আধুনিক সভ্য জাতিকে যা কিছু দিয়েছে তা ইত:পূর্বেই মহানবী (স.)-এর মদীনা সনদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এ যুগান্তকারী সনদ সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব আনয়ন করে।

মহানবীর শ্রেষ্ঠত্ব

মদীনা সনদের মাধ্যমে মহানবীর বিচক্ষণতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, কলহ নিরসনের ক্ষমতা, ধর্ম প্রচারের কৌশল প্রভৃতি অনন্য গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মহানবী (স.) শাসন, আইন, সমর, বিচার প্রভৃতি বিভাগের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন। তাই এসব বিবেচনা করেই অধ্যাপক মুর বলেছেন- "মুহম্মদের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব মননশীলতা শুধু তাঁর যুগেই নয় ; বরং সর্বযুগের ও সর্বকালে মহামানবের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।"

সারকথা

মদীনার সনদ ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। রাসূল (স.)-এর দূরদর্শিতা যে কত বেশী ছিল, তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কতটা তীক্ষ্ণ ছিল এ সনদের ধারাগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তা অনুমান করা যায়। লিখিত সংবিধান প্রণয়নের দৃষ্টান্ত হিসেবে যুগ যুগ ধরে এ সনদ গোটা বিশ্ববাসীকে অনুপ্রেরুা যোগাবে। এ সনদ বিশ্ববাসীর জন্য এক অভূতপূর্ব পাথেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন।

১. মদীনার সনদ কে প্রণয়ন করেন ?

ক. মহান আল্লাহ; খ. রাসূল (স);
গ. মুসলমানগণ; ঘ. মদীনার বিভিন্ন গোত্র।

২. ইবনে ইসহাকের মতে মদীনা সনদে মোট কয়টি ধারা লিপিবদ্ধ হয়েছে ?

ক. ৪৩টি; খ. ৪৫টি;
গ. ৫০টি; ঘ. ৫৩টি।

৩. মদীনা সনদ পৃথিবীর কততম লিখিত সংবিধান ?

ক. ৫ম; খ. ১ম;
গ. ৩য়; ঘ. ২য়।

৪. কোন কোন গোত্রের মাঝে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ?

ক. মুসলমান ও ইয়াহূদীদের মাঝে; খ. মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মাঝে;
গ. মদীনার সকল গোত্র ও সাম্প্রদায়ের মাঝে; ঘ. মুসলমান ও মুনাফিকদের মাঝে।

৫. মদীনার সনদের ফলে মুসলমানদের কি লাভ হয় ?

ক. ইসলাম প্রচারের সুবিধা লাভ হয়; খ. রাসূলের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়;
গ. মদীনায় শান্তি ফিরে আসে; ঘ. উপরে উল্লিখিত সব ক'টি উত্তর ঠিক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. মদীনার সনদ বলতে কী বুঝেন? সংক্ষেপে লিখুন।
২. সনদের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ ধারা উল্লেখ করুন।
৩. মদীনার সনদ বিশ্বের ১ম লিখিত সংবিধান- ব্যাখ্যা করুন।
৪. রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার অনন্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে মদীনার সনদ- আলোচনা করুন।
৫. মদীনার সনদের ফলে কীভাবে রাসূল (স.)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়- বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. মদীনা সনদের ধারা ও গুরুত্বসমূহ বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ ঃ ৩

মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ইসলামী রাষ্ট্র যে সকল দিক থেকে অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে বিশেষত্বের অধিকারী তা বলতে পরবেন।
- প্রকৃত অর্থে সার্বভৌত্বের অধিকারী কে তা আলোচনা করতে পারবেন।
- ইসলামী রাষ্ট্রের কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মূলনীতি কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নাগরিকের নৈতিক মান উন্নয়নে ইসলামী রাষ্ট্র বিশেষ কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পর যে মুসলিম সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে এবং হিজরতের পর রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে এর পর মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করে, যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল কুরআন মজীদের রাজনৈতিক শিক্ষার উপর। সে মদীনা ইসলামী রাষ্ট্র বিভিন্ন দিক থেকে অনন্য সাধারু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। নিম্নে বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হল-

এক ঃ আইনের কর্তৃত্ব এবং সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর

এ রাষ্ট্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, একমাত্র মহান আল্লাহই সার্বভৌমত্বের অধিকারী। ঈমানদারদের শাসন হচ্ছে মূলত খিলাফত বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল শাসন। কাজেই বলগাহীনভাবে কাজ করার তাদের কোনো অধিকার নেই। বরং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ থেকে উৎসারিত আল্লাহর আইনের অধীনে কাজ করা তাদের অপরিহার্য কর্তব্য। কুরআন মাজীদের যেসব আয়াতে এ মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী।" (সূরা আন-নিসা : ৫৯)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর অসংখ্য বাণীতে এ মূলনীতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ

عليكم بكتاب الله فاحلوا ما أحل لكم و حرموا ما حرم عليكم

"আল্লাহর কিতাব মেনে চলা তোমদের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহর কিতাব যা হালাল করে দিয়েছে, তোমরা তাকে হালাল মানো, আর যা হারাম করেছে, তোমরা তাকে হারাম মানো।" (মুসনাদে আহমাদ)

তিনি আরো বলেন-

"আল্লাহর তা'আলা কিছু করণীয় ও বৈধ বিষয় নির্ধারু করে দিয়েছেন, তোমরা তা নষ্ট করোনা, আর কিছু অবৈধ বিষয় নির্দিষ্ট করেছেন, তোমরা তাতে ঢুকে পড়োনা। কিছু সীমা নির্ধারু করেছেন, তোমরা তা অতিক্রম করোনা, যে সব ব্যাপারে তিনি মৌনতা অবলম্বন করেছেন তোমরা তার সন্ধানে পড়ো না।"

তিনি আরো বলেন,

إذا أمرتكم بشئ فخذوه و إذا نهيتكم عن شئ فانتهوا عنه

"আমি যখন তোমাদের কোন বিষযের নির্দেশ দেই তোমরা তা গ্রহণ করবে, আর যে বিষয় থেকে নিষেধ করি, তা থেকে বিরত থাকবে।"

দুই ঃ সকল মানুষের প্রতি সুবিচার

দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যের উপর মদীনা রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, তা ছিল কুরআন-সুন্নাহর দেয়া আইন যা সকলের জন্য সমান। রাষ্ট্রের সামান্যতম ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র প্রধান পর্যন্ত সকলের উপর তা সমভাবে প্রয়োগ হতো। তাতে কারো জন্য কোনো ব্যতিক্রমধর্মী আচরণের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে একথা ঘোষণা করার নির্দেশ দেন ঃ

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ

"এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করতে।" (সূরা আশ-শূরা : ১৫)

অর্থাৎ পক্ষপাতমুক্ত সুবিচার নীতি অবলম্বন করার জন্য আমি আদিষ্ট ও নিয়োজিত। পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বন করে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়া আমার কাজ নয়। সকল মানুষের সাথে আমার সমান সম্পর্ক, আর তা হচ্ছে আদ্‌ল ও সুবিচারের সম্পর্ক। সত্য যার পক্ষে, আমি তার সাথী ; সত্য যার বিরুদ্ধে, আমি তার বিরোধী। আমার অনন্তজীবন ব্যবস্থায় কারো জন্য কোনো পার্থক্যমূলক ব্যবহারের অবকাশ নেই। আপন পর, ছোট বড়, শরীফ ও নিচুর জন্য পৃথক পৃথক অধিকার সংরক্ষিত নেই। যা সত্য তা সকলের জন্যই সত্য; যা পাপ, তা সকলের জন্যই পাপ ; যা অবৈধ, তা সবার জন্যই অবৈধ ; যা বৈধ, তা সবার জন্যই বৈধ ; যা ফরয, তা সকলের জন্যই ফরয। আল্লাহর আইনের এ সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে আমার নিজের সত্ত্বাও মুক্ত নয়, নয় ব্যতিক্রম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন ঃ

إنما هلك من كان قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا و إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدود والذى نفس محمد بيده لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

"তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত ছিল তারা এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, নিম্ন পর্যায়ের অপরাধীদেরকে আইন অনুযায়ী শাস্তি দিতো, আর উচ্চ পর্যায়ের অপরাধীদেরকে ছেড়ে দিতো। সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, (মুহাম্মাদের আপন কন্যা) ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে ফেলতাম।" (বুখারীও মুসলিম)

তিন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সাম্যপ্রতিষ্ঠা

এ রাষ্ট্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, বংশ, বর্ণ, ভাষা এবং দেশকাল নির্বিশেষে সকল মুসলমানের অধিকার সমান, এ মূলনীতির প্রতিষ্ঠা করা। এ রাষ্ট্রের পরিসীমায় কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, বংশ বা জাতি বিশেষ কোন অধিকার লাভ করতে পারেনি, অন্যের মুকাবিলায় কারো মর্যাদা খাটো হতে দেয়া হয়নি।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই"। (সূরা আল-হুজুরাত : ১০)

তিনি আরো বলেন-

يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"হে মানব ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।" (সূরা আল-হুজুরাত : ১৩)

নবী করীম (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি এ মূলনীতিকে আরও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন ঃ

إن الله لا ينظر إلى صوركم و أموالكم بل الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

"আল্লাহ তোমাদের চেহারা এবং ধন সম্পদের দিকে তাকান না বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কার্যাবলীর দিকে তাকান" (মুসলিম)

তিনি আরো বলেন,

يا أيها الناس إن ربكم واحد لا مجد لعربى على عجمى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى.

"হে মানব জাতি ! শোন, তোমদের রব এক। অনারবের উপর আরবের বা আরবের উপর অনারবের কোন মর্যাদা নেই। সাদার উপর কালোর বা কালোর উপর সাদারও নেই কোন শ্রেষ্ঠত্ব। হাঁ, অবশ্য তাক্ওয়ার বিচারে।" (বায়হাকী)

চার ঃ সরকারের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা

এ রাষ্ট্রের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল, এ রাষ্ট্রের প্রশাসন, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও অর্থ সম্পদকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গণ্য করা হত। আল্লাহভীরু, ঈমানদার এবং ন্যায়পরায়ণ লোকদের হাতে তা ন্যস্ত ছিল। কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত বা নিজ স্বার্থে আমানতের খেয়ানত করার অধিকার রাখত না। এ আমানত যাদের উপর সোপর্দ করা হয়েছিল তারা এজন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিল। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে বলেনঃ

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً.

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পন করতে। তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা কামনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা আন-নিসা : ৫৮)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন-

ألا كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته و الإمام راع و مسؤول عن رعيته

"সাবধান ! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানদের সর্বোচচ শাসক, তিনিও দায়িত্বশীল তাঁকেও তাঁর প্রজাদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।" (বুখারী)

তিনি আরো বলেন,

"মুসলিম প্রজাদের প্রধান দায়িত্বশীল কোন শাসক যদি তাদের সাথে প্রতারণা এবং খিয়ানতকারী অবস্থায় মারা যায় তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।" (বুখারী)

"মুসলিম রাষ্ট্রের কোন পদাধিকারী শাসক যে নিজের পদের দয়িত্ব পালন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা করে না, নিষ্ঠার সাথে কাজ করে না ; সে কখনো মুসলমানদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (মুসলিম)

পাঁচ ঃ শূরা বা পরামর্শ

এ রাষ্ট্রের পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মুসলমানদের পরামর্শ এবং তাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হত। রাষ্ট্রপ্রধান পরামর্শের ভিত্তিতে সকল কাজ পরিচালনা করতেন। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে।" (সূরা আস-শূরা : ৩৮)

তিনি আরো বলেন,

وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلأَمْرِ

"এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৫৯)

ছয় ঃ ভালো কাজে আনুগত্য

৬ষ্ঠ মূলনীতি-যার উপর এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল তা হল, কেবল মারুফ বা ভাল কাজেই সরকারের আনুগত্য অপরিহার্য। পাপাচারে (মা'সিয়াত) আনুগত্য পাওয়ার অধিকার কারোর নেই। অন্য কথায়, এ মূলনীতির তাৎপর্য এই যে, সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কেবল সেসব নির্দেশই তাদের অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ এবং প্রজাসাধারু মেনে চলত, যা আইনানুগ এবং বৈধ। আইনের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেয়ার তাদের কোন অধিকার ছিল না। কুরআন

মজীদে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাইয়াত ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণের ক্ষেত্রেও আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আল্লাহ বলেন,

وَلاَ يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ

"এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না।" (সূরা আল-মুমতাহানা : ১২)
রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

على المسلم السمع و الطاعة للأمير فى المكروه و المحبوب إلا بالمعصية و إذا أمر بالمعصية فلا طاعة

"একজন মুসলমানের উপর তার আমীরের আনুগত্য করা, শোনা এবং মেনে চলা ফরয ; তা তার পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক, যতক্ষণ তাকে কোন মা'সিয়াত বা পাপাচারের নির্দেশ না দেয়া হয়। মা'সিয়াত বা অবৈধ কাজের নির্দেশ দেয়া হলে কোন আনুগত্য নেই।" (বুখারী)
তিনি আরো বলেন ঃ

لا طاعة فى المعصية إنما الطاعة فى المعروف.

"আল্লাহর নাফরমানীতে কোন আনুগত্য নেই ; আনুগত্য কেবল মারূফ বা সৎ কাজে।" (মুসলিম)

সাত ঃ পদমর্যাদার দাবী এবং লোভ নিষিদ্ধ

মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সাধারুত রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য সে ব্যক্তিই বেশী অযোগ্য-অনুপযুক্ত, যে নিজে পদ লাভের অভিলাষী এবং সে জন্য সচেষ্ট।
আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন ঃ

تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِى ٱلأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً

"এ তো আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না।" (সূরা আল-কাসাস : ৮৩)
নবী (স) বলেন ঃ
"আল্লাহর শপথ, এমন কোন ব্যক্তিকে আমরা এ সরকারের পদ মর্যাদা দেই না, যে তা চায় এবং তার জন্য লোভ করে।" (বুখারী)
"যে ব্যক্তি নিজে তা সন্ধান করে, আমাদের নিকট সে-ই সবচেয়ে বেশী খেয়ানতকারী।" (আবু দাউদ)

আট ঃ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য

এ রাষ্ট্রের শাসক এবং তার সরকারের সর্ব প্রথম কর্তব্য এই ছিল যে, কোন রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই যথাযথভাবে সে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করবে, ইসলামের চারিত্রিক মানদন্ডানুযায়ী ভাল ও সৎ-গুণাবলীর বিকাশ ঘটাবে। মন্দ ও অসৎ গুণাবলীর বিনাশ সাধন করবে্ কুরআন মজীদে এ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى ٱلأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلواَةَ وَآتَوُاْ ٱلزَّكواةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ

"আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ নিষেধ করবে।" (সূরা আল-হজ্জ : ৪১)
কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলিম মিল্লাতের অস্তিত্বের মূল লক্ষ্যও এটিই ঃ আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।" (সূরা আলে-ইমরান : ১১০)
এতদ্ব্যতীত যে কাজের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার পূর্বেকার সকল নবী-রাসূল আদিষ্ট ছিলেন, কুরাআনের দৃষ্টিতে তা ছিল এই ঃ

أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ

"তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে মতভেদ করো না।" (সূরা আশ-শূরা : ১৩)

নয় ঃ ভাল কাজে সহযোগিতা এবং অন্যায় কাজে বাধা প্রদান

এ রাষ্ট্রের আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, মুসলিম সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি সত্য বাক্য উচ্চারু করবে, সৎ ও কল্যাণের সহায়তা করবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের যেখানেই কোন ভুল এবং অন্যায় কাজ হতে দেখবে, সেখানেই তাকে প্রতিহত করতে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। মুসলিম সমাজের প্রতিটি সদস্যের এটা শুধু অধিকারই নয়, বরং অপরিহার্য কর্তব্যও। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের নির্দেশ হচ্ছেঃ

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ

"সৎ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।" (সূরা আল-মায়েদা : ২)

তিনি আরো বলেন,

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।" (সূরা আল-আহযাব : ৭০)

এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেছেন-

من رآى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان

"তোমাদের কেউ যদি কোন মুনকার (অসৎ কাজ) দেখ, তবে তার উচিত হাত দিয়ে তা প্রতিহত করা। তা যদি না পার তবে মুখ দ্বারা বাধা দাও আর তাও যদি না পার তাহলে অন্তর দ্বারা বাধা দেয়ার পরিকল্পনা কর আর এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।" (মুসলিম)

তিনি আরো বলেন,

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

"যালেম শাসকের সামনে ন্যায় বা সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।" (আবু দাউদ)

তিনি আরো বলেন,

"আমার পর কিছু লোক শাসক হবে, যে ব্যক্তি মিথ্যার ব্যাপারে তাদেরকে সাহায্য করবে, সে আমার নয় এবং আমি ও তার নই।"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্বের প্রকৃত অধিকারী-

ক. জনগণ; খ. সরকার;
গ. মহান আল্লাহ; ঘ. রাষ্ট্র।

২. রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলের আনুগত্য করতে হবে-

ক. সকল আদেশ নিষেধে; খ. শুধু সত্য ও সৎ কাজে;
গ. অন্যায় কাজেও; ঘ. কোনটিই ঠিক নয়।

৩. কাউকে অন্যায় করতে দেখলে হাদীসের নির্দেশ হল প্রথমে-

ক. মুখ দ্বারা বাধা দেবে; খ. হাত দ্বারা বাধা দেবে;
গ. মনে মনে পরিকল্পনা করবে; ঘ. কিছুই করবে না।

৪. কোনটি ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য-

ক. পরামর্শ ভিত্তিক সকল কাজ পরিচালিত করা; খ. ভাল কাজে আনুগত্য;
গ. পদের দাবী করা নিষিদ্ধ; ঘ. সব ক'টিই ঠিক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব কার? সংক্ষেপে লিখুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্র শূরা বা পরামর্শ ভিত্তিক পরিচালিত হয়- প্রমাণসহ আলাচনা করুন।
৩. ইসলামী রাষ্ট্র অন্যায়কে বাধা প্রদান করে- প্রমাণসহ উল্লেখ করুন।
৪. একমাত্র সৎ কাজেই অনুগত্য করতে হবে-আলোচনা করুন।
৫. মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের গুরূত্বপূর্ণ ৫টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৪

মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সচিবালয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- ◆ মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সচিবালয়সমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ◆ মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ◆ মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের অবকাঠামোগত গোড়াপত্তন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরু সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব

এক দশকের কম সময়ের মধ্যে মহানবী (স)-এর প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্র এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয় যাকে মুসলমানদের জাতীয় রাষ্ট্র বলা যায়। পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক নবী মুহাম্মদ (স) ছিলেন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্বের একমাত্র উৎস। আইন, প্রশাসনিক, সামরিক ও বিচার বিভাগীয় সকল ক্ষমতা তাঁর হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। একটা সরকার ও প্রশাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবীকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ করে তাঁদের নিকট তিনি স্বীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন। তাঁর এ প্রশাসন যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক বা বিভাগীয় এবং স্থানীয় প্রশাসকগণ। কেন্দ্রীয় প্রশাসক হিসেবে ছিলেন স্বয়ং নবী (স) তাঁর সকল প্রতিনিধি, উপদেষ্টা (মুশীর), সচিব (কাতিব), দূত (রাসূল), কমিশনার কবি (শুয়ারা) ও বক্তা (খুতাবা) এবং আরও নানা ধরনের কর্মকর্তাগণ। অপরপক্ষে প্রাদেশিক কর্মকর্তারা ছিলেন বিভিন্ন গভর্নর (ওয়ালী), স্থানীয় প্রশাসকবৃন্দ (রুআসা), স্থানীয় প্রতিনিধিবর্গ (নকীব), বিচারকবৃন্দ (কুজাত) ও বাজার কর্মকর্তা (সাহিবুস-সূ'ক) গণ এদের সকলকে নিয়ে নবী করীম (স)-এর এক দশকের শাসনামলের প্রশাসনের বিভিন্ন শাখা ও কর্মকর্তাদের নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

প্রশাসনিক কর্মকা⇒ পরিচালনার সুবিধার্থে তিনি তাঁর প্রশাসনকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন। বর্তমানে ঐ বিভাগগুলোর প্রতিটি এক একটি সবিচালয় হিসেবে গণ্য করা যায়। মহানবীর প্রতিষ্ঠিত বিভাগ ও সচিবালয়সমূহ নিম্নরূপ ছিল।

স্বরাষ্ট্র বিভাগ

রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারসমূহের ব্যাপারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পূর্ণ সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যাপারে তিনি ভাষা, গোত্র ও শ্রেণীর ভেদ করতেন না, সাদা কালোর পার্থক্য করতেন না অর্থাৎ দেশের যে কোন নাগরিক চাই মুসলিম হোক, বা অমুসলিম উচ্চ বংশের হোক বা নিম্ন বংশের ; সুন্দর হোক কি কুৎসিৎ, ধনী হোক কি দরিদ্র সকল নাগরিককে বিনা পার্থক্যে কোরআনের অনুসৃত মৌলিক অধিকার প্রদান করতেন। জানমাল ইজ্জত সম্মান ও নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা, নারী-পুরূষ, ক্রীতদাস ও নিম্নশ্রেণীর নাগরিকদের সার্বিক নিরাপত্তা, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের আকিদা, বিশ্বাস ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, এতীম অভাবী ছিন্নমূল ও অক্ষম লোকদের সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রতিপালন প্রভৃতি ছিল মহানবী (স) -এর স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু অমুসলিমকে চাপ প্রয়োগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করার কোন বিধান ছিল না, বরং তারা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আনুগত্য স্বীকার করে নিত তবে তাদেরকে রাষ্ট্রের মৌলিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা পরিপূর্ণভাবে প্রদান করা হতো। তবে তাদেরকে রাষ্ট্রের যাবতীয় আইন কানুন মেনে নিতে হতো এবং রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে জানমাল সহ অংশ গ্রহণ করতে হতো। এ সম্পর্কে কয়েকটি মূল নীতি নির্ধারু করা হয়েছিল-

- ♦ তারা ইসলামী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করবে।
- ♦ দেশের আইন মেনে চলবে এবং কোন প্রকার বিভ্রান্তি, বিশৃঙ্খলা ও দেশের জন্য ক্ষতিকর এমন কোন কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভাবেই অংশ গ্রহণ করতে পারবে না বা কেউ এসব কাজে লিপ্ত হলে তাকেও কোন প্রকার সাহায্য বা সমর্থন দিতে পারবে না।
- ♦ দেশের সকল উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্য করতে হবে।

- রাসূল (স)-এর স্বরাষ্ট্র নীতি ছিল দেশের সকল শ্রেণী ও মৈত্রীর সংগে মিলেমিশে বসবাস করা। আর কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দিলে সকলে মিলে-মিশে শৃঙ্খল ফিরিয়ে আনা।

বিচার বিভাগ

সুবিচার প্রতিষ্ঠাকে একটি রাষ্ট্রের মেরুদন্ড বলা যেতে পারে। ইসলাম স্বভাবগত ধর্ম হওয়ার কারণে সুবিচারের প্রতি সর্বাধিক গরুত্ব প্রদান করে। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স) সুবিচারের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। ধনী-দরিদ্র, মুসলিম-অমুসিলম, বন্ধু-শত্রু সকলের জন্য তাঁর ইনসাফ ও সুবিচার ছিল সমান। তিনি কোন ব্যক্তির অপরাধ সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে শাস্তি প্রদান করতেন না।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর জীবদ্দশায় নিজেই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং প্রাদেশিক ও স্থানীয়ভাবে বিচারপতিদের নিয়োগ তিনি নিজেই করতেন। হযরত মুহাম্মদ (স) বিভিন্ন এলাকা ও বিভিন্ন সময়ের জন্য যেসব বিচারপতি নিয়োগ করেন তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ, হযরত উবাই বিন কাব, ও হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা) প্রমুখ সাহাবীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। (বিচার বিভাগ সম্পর্কে অত্র ইউনিটের ৫ নং পাঠে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

অর্থ বিভাগ

বিশ্বের সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হযরত রাসূলে করীম (স) একদিকে নাগরিকদের নৈতিক মান উন্নীত করেছেন অন্যদিকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে পবিত্র রাখার সুব্যবস্থা করেছেন। তার পাশাপাশি তিনি জনগণের অর্থনৈতিক বৈষম্যও দূরীভূত করার বিধান প্রবর্তন করেছেন যাতে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয়। একথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান স্বরূপ।

এ পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র জীবন-বিধান, যা তার মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাসের পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিধি বিধানকেও যথা যোগ্য স্থান দিয়েছেন। ইসলাম মানুষের প্রয়োজন ও দুঃখ-কষ্ট লাঘবকে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষণা করেছে। ইসলামী বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে শুধু যে, দারিদ্র পীড়িত মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করেছে তাই নয় বরং ধনীদের সম্পদকে পবিত্র করার একটি বাস্তব ব্যবস্থাও করেছে। রাষ্ট্র ও নাগরিকের ব্যয় মেটানোর জন্য।

রাসূলুল্লাহ (স) রাষ্ট্রীয় উপার্জনের প্রধান খাত হিসেবে পাঁচটি খাতকে নির্বাচিত করেছিল। খাতগুলো হলঃ গনিমত, ফাই, যাকাত, জিযিয়া ও খারাজ।

শিক্ষা বিভাগ

দেশ পরিচালনা ও প্রশাসনের জন্য শিক্ষা অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ বিষয়। হযরত মুহাম্মদ (স) শিক্ষার প্রসারের জন্য সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। প্রখ্যাত সাহাবীদেরকে এ দায়িত্বে নিয়োজিত করে রাখা হয়েছিল। অনেককে শিক্ষার প্রধানতম উৎস ওহী লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল।

তদানীন্তন আরব ভূমিতে শিক্ষা-দীক্ষার তেমন প্রচলন ছিল না। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য, কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ (স) শিক্ষালাভ ও জ্ঞান অর্জনকে জেহাদ তুল্য ঘোষণা করেন। প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরয" করে দেন। তিনি জ্ঞানের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলেন, "শিক্ষা নবীশদের সম্মানার্থে ফেরেশতারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেন।" একবার তিনি বলেন, "জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা ইবাদতকারী ব্যক্তির চেয়ে ততটুকু উপরে, যতটুকু আমার মর্যাদা তোমাদের (সাহাবীদের) একজন সাধারু ব্যক্তির উপরে।" তিনি পবিত্র মক্কায় 'দারুল আরকাম' কে প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রহণ করেন।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে যে সকল মুশরিক বন্দী হয় তাদের মধ্যে অনেকের মুক্তিপণ ছিল দশ ব্যক্তিকে স্বাক্ষর জ্ঞানদান।

রাসূলে করীম (স) শিক্ষার প্রতি কত গুরুত্ব দিয়েছিলেন এ ঘটনা থেকে তা অনুভব করা যায়।

মদীনা মোনাওয়ারায় শিক্ষা ও স্বাক্ষর জ্ঞানের জন্য হযরত সাইদ বিন আ'স (রা)-কে নিয়োগ করা হয়েছিল। মসজিদে নববীর নির্মাণ সুসম্পন্ন হওয়ার পর সেখানে হযরত রাসূলুল্লাহ (স) একটি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। নিঃস্ব ও আশ্রয়হীন সাহাবাগণ ঐ শিক্ষাকেন্দ্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট জ্ঞান অর্জন করত। স্থানীয় ছাত্র ব্যতীত দূর দূরান্ত থেকেও অনেক এসে ঐ শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করতেন। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন গোত্রের অনুরোধক্রমে রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা মোনাওয়ারা থেকে শিক্ষক প্রেরু করতেন। রাসূলুল্লাহ(স) ওহী লেখক হযরত যায়েদ বিন ছাবেতকে ইব্রানী ভাষা শিক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত যায়েদ (রা) নিজে বলেছেন ঃ আমি অল্প কয়েকদিনেই এ ভাষা শিক্ষা লাভ করি। মহানবী (স) তাঁর বিভিন্ন বাণীতে শিক্ষাদান পদ্ধতি কি হওয়া উচিৎ তা উল্লেখ করেন। ইমাম বুখারী মহানবী (স)-এর এসব বাণীকে গবেষণা করে শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর সংকলিত গ্রন্থ বুখারী শরীফে বর্ণনা করেছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে অল্প দিনের মধ্যেই মুসলিম জাতি তদানীন্তন বিশ্বের শিক্ষকরূপে পরিত হয়।

কৃষি বিভাগ

আরব ভূমির অধিকাংশ এলাকাই বালুকাময় মরুভূমি ছিল। মহান নবী (স) মানুষকে বহু অনাবাদী জমি চাষাবাদের জন্য দান করেন এবং অধিক ফসল ফলনোর জন্য তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করেন।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন- হযরত রসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন- যার নিকট চাষাবাদ যোগ্য জমি থাকবে তার অবশ্যই তাতে চাষাবাদ করা উচিৎ অন্যাথায় অন্যকে চাষাবাদের জন্য প্রদান করা উচিত।" অর্থাৎ আবাদযোগ্য জমি যেন অনাবাদি না থাকে।

বৃক্ষরোপন সম্পর্কেও মহানবী (স) অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহ প্রদান করতেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) এরশাদ করেন- কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপন করে অথবা কোন চাষ করে তবে ঐ বৃক্ষের ফল, উৎপাদিত শস্য মানুষ, পশুপাখি অথবা অন্য জীবজন্তু খায় তাহলে বৃক্ষ রোপনকারী দান করার প্রতিদান পাবে।

অধিক শস্য ফলানোর জন্য হযরত রাসূলে করীম (স) সেচ ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। সাহাবায়ে কেরামকে এজন্য পারস্পরিক সহযোগিতা করার উপদেশ দান করেন। জমি চাষের ক্ষেত্রে বর্গা অথবা ইজারা নীতি কি হবে তা তিনি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। মুসলিম শরীফে এ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।

দাওয়াত ও ধর্ম প্রচার বিভাগ

একটি দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নতির জন্য সে জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনা করা যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনিভাবে সর্বদা জাতিকে সত্যের দিকে আহবান ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। মহান আল্লাহ বলেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।" (সূরা আলে-ইমরান : ১১০)

রাসূল (স) বলেন-

فليبلغ الشاهد منكم الغائب

"তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছ তারা অনুপস্থিত লোকদের নিকট আমার বাণী পৌঁছে দিবে।" (বুখারী)

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য রাসূলুল্লাহ স প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও অত্যন্ত সুযোগ্য একটি দল তৈরী করেছিলেন। তারা বিভিন্ন এলাকায় দ্বীন ইসলামের তাবলীগ ও কুরআনে পাকের শিক্ষাদান কাজে রত থাকতেন। মসজিদের ইমামও রাসূলুল্লাহ (স) সরকারী ভাবেই নিয়োগ করতেন। তাঁরা স্ব-স্ব মসজিদে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেন। এছাড়া মহানবী (স) বিভিন্ন এলাকায় দায়ী প্রেরু করতেন।

পরামর্শ বিভাগ

মজলিসে শূরা

কোন কাজ সম্পাদনের পূর্বে সে কাজের বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তিদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করার উপর ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও পরামর্শের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কুরআন পাকের একটি সূরার নামকরুও করেছেন "শূরা" (পরামর্শ) শব্দ দ্বারা। আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে বলেছেনঃ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ "তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে।" (সূরা আশ-শূরা : ৩৮)

সূরা আল-ইমরানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে সম্বোধন করে বলেছেন-

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।" (সূরা-আল-ইমরান-১৫৯)

তাই, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদনের পূর্বে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করা অনিবার্য আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। বদর, উহুদ, খন্দকের যুদ্ধসহ হোদায়বিয়ার সন্ধি ইত্যাদি ঘটনায় সিদ্ধান্ত নেয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করেন।

রাসূলুল্লাহ (স) যদিও ওহী দ্বারা সরাসরি নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতেন এবং ঐ জ্ঞানের আলোকে তাঁর কার্যাবলী পরিপূর্ণ নির্ভুলভাবে সম্পাদিত হত, আর এজন্য তিনি অন্যের কোন পরামর্শ গ্রহণের মুখাপেক্ষী ছিলেন না, তবুও বিষয়টির গুরুত্বের কারণে তিনিই সর্বাধিক পরামর্শ করতেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশ (রা.) বলেন ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেয়ে অধিক পরামর্শ করতে অন্য কাউকেও দেখিনি।"

পররাষ্ট্র বিভাগ

পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এজন্য তিনি যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করেছিলেন তার উল্লেখযোগ্য বিষয় সমূহের মধ্যে ছিল-

- আরব দেশের সীমান্তগুলোকে বাইরের আক্রমণের আশংকা থেকে নিরাপদ করা।
- ইয়ামান, আম্মান, বাহরাইন ও ইরানী দখলদারদের থেকে মুক্ত করা।
- সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকা দোমাতুল জনদল এবং অন্যান্য এলাকা হতে রোমনদের কর্তৃত্ব তুলে দেয়া।
- পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহ- আবিসিনিয়া, ইরান ও মিশরের রাষ্ট্রনায়কদের নিকট পত্রযোগে ইসলামের দাওয়াত দেয়া এবং সংগে সংগে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার অনুরোধ করা।
- শত্রু কখনো আক্রমণ করতে চাইলে তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে প্রবেশ করার সুযোগ না দিয়ে সীমান্তেই তাদের মোকাবেলা করা। তবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) এ নীতি গ্রহণ করেছিলেন।
- রাষ্ট্রদূতদের প্রাণের নিরাপত্তা বিধান ইসলামী পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেউ এর লঙ্ঘন করলে রাসূলুল্লাহ (স) তার বিরূদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতেন।

হযরত হারেস (রা) নামক একজন দূতকে বসরার গভর্ণর হত্যা করায় প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স) তার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য ৩ হাজার সৈন্য প্রেরু করেন। আর মুতার যুদ্ধ এজন্যই সংঘটিত হয়। পারস্য সম্রাট তাঁর প্রেরিত চিঠি ছিঁড়ে ফেললে এবং দূতকে অপমান করলে তাকে অভিশম্পাৎ করেন। কোন গোত্রের সঙ্গে চুক্তি হলে তিনি তা পুরোপুরি রক্ষা করতেন যতক্ষণ না প্রতিপক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করত, কুরআনের বাণী وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا 'তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে।' (সূরা আল-আনফাল : ৬১)

সমাজকল্যাণ বিভাগ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স) ইতিহাসের প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। এমনি রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য কল্যাণবাদী সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব পূর্বশর্ত। যে সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, পরস্পর পরস্পরের কল্যাণ কামনা করে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে তা অন্যের জন্যেও পছন্দ করে। একে অন্যের দুঃখ নিবারণে সমভাবে সচেষ্ট হয়। বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ সাধনে সকলেই অগ্রগামী হতে সচেষ্ট হয়। প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ (স) এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন যা, পৃথিবীতে অদ্বিতীয়, অনন্য সাধারু, সকলের জন্য অনুসরুীয় এবং সর্বত্র প্রশংসনীয়। যে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি যাবতীয় নৈতিক গুণে গুণান্বিত, ধৈর্য ও সহনশীলতা, পরস্পরের সহযোগিতা, সহমর্মিতা, আর্তের প্রতি দয়া, অনাথ, বিপদগ্রস্ত মানুষের সেবা প্রত্যেকেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এমনি একটি সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করতে গিয়েই মাহনবী (স) বলেছেন-

ارحموا من فى الأرض يرحمكم من في السماء

"পৃথিবীতে যারা বসবাস করে তাদের দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে ঊর্ধ্বে অবস্থিত মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াবান হবেন।"

তিনি আরও বলেছেন তোমরা মোমিনদেরকে পরস্পরে মধ্যে দয়ামায়ায় এবং সহমর্মিতায় একটি দেহের মত পাবে। দেহের একটি অংশে ব্যাথা পেলে তা সর্বাংশে অনুভূত হয়। এরকম অগণিত বাণী হাদীস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সামরিক বিভাগ

কোন স্বাধীন দেশের নিরাপত্তা ও শক্তি সে দেশের সামরিক বাহিনীর শক্তির উপর নির্ভরশীল। এজন্য সামরিক বাহিনীকে অনেক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়।

কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) যে সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন তারা কোন সরকারের বাহিনী ছিল না। বরং তারা সকলেই ছিলেন আল্লাহর সৈনিক। তাদের জন্য কোন বেতন ভাতা ধার্য ছিল না। তারা গণিমতের সম্পদের আশায়ও লড়াই করতেন না। তাদের লড়াই, জীবন-মরু সবই ছিল এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য। সামরিক বাহিনীতে তাদের ভর্তির প্রয়োজন হত না, যখনই জেহাদের ডাক আসতো তখনই পরিুত বয়সের প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানই তাতে অংশ গ্রহণ করে আত্মোৎসর্গ করার জন্য নিজেকে পেশ করতেন।

আল্লাহ পাকের সৈনিকদেরকে শুধু মাত্র তখনই অস্ত্র পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হত যখন মুসলিম জাতি অথবা দেশকে ধ্বংস করার জন্য শত্রু আক্রমণ করত অথবা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করত। এছাড়া দুস্কর্ম, বিশৃঙ্খলা ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিদ্রোহ দমনের জন্য এবং জুলুম নিপীড়ন ও দুর্বল ও মজলুমদের সাহায্যার্থে লড়াই-এর অনুমতি ছিল।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত বড় বড় যুদ্ধগুলো তিনি নিজেই পরিচালনা করেছেন, আর ছোট ছোট যুদ্ধে কোন বিশিষ্ট সাহাবীকে সেনাপতি নিযুক্ত করে তা পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করছেন। মুসলিম বাহিনীর সামরিক কলা-কৌশল শিক্ষাদান ছাড়াও তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক তরবিয়তের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হত। তাই রাসূলুল্লাহ (স) সৈনিকদের সামান্য ত্রুটির জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। হযরত রাসূলে করীম (স) যুদ্ধের পূর্বে সৈন্যদের অত্যন্ত গুরুত্ব সহ সতর্ক করে দিতেন যে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যেন বৃদ্ধ, শিশু, মহিলা, ধর্মগুরু ও কৃতদাসদেরকে হত্যা করা না হয়। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "কোন যুদ্ধে প্রেরণের পূর্বে প্রিয়নবী (স) বৃদ্ধ, শিশু ও মহিলাদেরকে হত্যা না করার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ করছেন।" (মহানবী (স)-এর সামরিক বিভাগ সম্পর্কে (অত্র ইউনিটের ৬নং পাঠে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।)

কাতিব (সচিববৃন্দ)

মহানবী (স) তাঁর বিভিন্ন লিখন কর্ম সম্পাদন করার জন্য অনেক সচিব নিয়োগ করেছিলেন। সচিবের আরবি প্রতি শব্দ ''কাতিব''। কাতিব শব্দের শাব্দিক অর্থ লেখক। কিন্তু কালের বিবর্তনে শব্দটি একট পরিভাষায় রূপ নিয়েছে যার অর্থ দাড়ায় সচিব। প্রাক-ইসলামী যুগেই শব্দটি উক্ত পারিভাষিক তাৎপর্য লাভ করেছিল। এটি "কিতাবাহ" (লিখন কলা) থেকে উৎসারিত। যারা লিখতে পারতেন তাদেরকে কাতিব বলা হত এবং সে কারণেই তাদেরকে উচ্চ সম্মান দেয়া হত। ইসলামের আবির্ভাবের পর লিখন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হল। মক্কায় অবস্থান কালে নবী (স) ওহী লিপিবদ্ধ করণের এবং রাজনৈতিক দলিল রচনার জন্য কয়েক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন। এক বর্ণনা মতে নবী (স).-এর মক্কী জীবনের প্রথম দিকে শূরাহবীল নামে একজন কাতিব ছিলেন। রাসূল (স) -এর মক্কা অবস্থানকালে আরও যাঁরা লেখকের দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ আব্দুল্লাহ ইবন সা'দ, সা'দ ইবন আবী সারহ, আবূ বকর, উমর, উসমান এবং আলী (রা)সহ আরও কিছু সংখ্যক সাহাবী।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর কাতিবদের কাজটি ধর্মীয় প্রকৃতি ছাড়াও রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। এর গোড়াপত্তন করেছেন স্বয়ং নবী (স)। তবে সে সময়ে এ বিভাগটি এ নামে পরিচিত ছিল না। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে তিনি তাঁর সামরিক কর্মকর্তা, গভর্ণর ও প্রশাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও নির্দেশ অবহিত করার জন্য পত্র বিনিময় করতেন এবং কর্মকর্তারাও তাঁর নিকট পত্র লিখতেন। অনুরূপ ভাবে তিনি বিভিন্ন শাসক ও যুবরাজদের নিকটও বেশ কিছু পত্র প্রেরু করেছিলেন এবং অনেক দূতকে স্বীয় পত্রসহ আরব ও অনারব নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। এছাড়া বেশ কিছু ব্যক্তি ও গোত্রের নিকট নবী (স) কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য পত্র প্রেরিত হয়েছিল। সবশেষে বলতে হয়, বহুব্যক্তির নিকট তিনি পত্র পাঠিয়েছেন। এসব দলিল পত্রের বিষয়াদি এমন এক বিভাগ কর্তৃক আনযাম দেয়া হত যেটা পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ একটি দিওয়ান-ই-ইনশাহ বা নথি-পত্র বিভাগে উন্নীত হয়েছে এবং স্বাভাবিক ভাবেই এক্ষেত্রে লেখক ও করণিকদের সেবাদানের প্রয়োজন হয়েছে।

সচিবদের সংখ্যা

বিভিন্ন সময়ে যারা নবী (স)-এর পক্ষে লেখকের দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা কত এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। ইবন ইসহাক ও ইবন হিশাম তাঁদের মাত্র কয়েক জনের নাম উল্লেখ করেন। অপর পক্ষে ঐতিহসিক ওয়াকিদী বেশ কিছু কাতিবের নাম বর্ণনা করেন। প্রাথমিক স্তরের লেখকদের মধ্যে ইবন সাদের বর্ণনামতে নবী (স)-এর দলিল-পত্রের কাতিবদের সংখ্যা দাড়ায় ১৬জন। অথচ বালাযূরী ও তাবারী মাত্র দশজনের নাম উল্লেখ করেন। বস্তুত এটা পরবর্তী গ্রন্থকারদের কৃতিত্ব যে, নবী (স) কর্তৃক নিযুক্ত কাতিবদের একটি পূর্ণ নাম- তালিকা সংকলন করতে গিয়ে তাঁরা সর্বাধিক সংখ্যক নাম পেশ করার এক সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছেন। তারা ২৩ ও ২৫ জন কাতিবের দু'টি তালিকা পেশ করেছেন। সে সবের অধিকাংশ ইবন সাদ এর পুস্তকেও উল্লিখিত হয়েছে। তবে আল-কুরতুবীর তাফসীরে ২৬টি নাম লক্ষ্য করা যায়। কারো কারো তালিকায় ৪০টি নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এ থেকে কাতিবদের নিয়োগের ধরন ও কর্মধারা সম্বন্ধে আমরা ধারণা করতে পারি। লক্ষ্যণীয় যে, কাতিবগণ স্থায়ী, খন্ডকালীন বা অস্থায়ী কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন
সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সচিবালয়গুলো তখনকার যুগে পরিচিত ছিল-
ক. বিভাগ নামে; খ. মন্ত্রণালয় নামে;
গ. দিওয়ান নামে; ঘ. কোন নামেই পরিচিত ছিল না।

২. নবী (স.)-এর জীবদ্দশায় মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি ছিলেন-
ক. হযরত আবু বকর (রা); খ. হযরত আলী (রা);
গ. হযরত আলী (রা); ঘ. মহানবী (স) স্বয়ং নিজেই।

৩. সচিবকে মহানবী স. এর যুগে বলা হত-
ক. কাতিব; খ. ওয়ালী
গ. আমিল; ঘ. কোনটি ঠিক নয়।

৪. মুসলমানগণ শত্রূদের বিরুদ্ধে কি ধরনের লড়াই করতেন-
ক. আক্রমণাত্বক; খ. আত্মরক্ষামূলক;
গ. দেশ রক্ষামূলক; ঘ. খ ও গ উভয় উত্তরই সঠিক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগ সম্পর্কে লিখুন।
২. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
৩. কাতিব ও সবিচদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৪. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ বিভাগ সম্পর্কে লিখুন।
৫. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের দাওয়াত ও ধর্মপ্রচার সম্পর্কে লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক, বিচার ও পরামর্শ বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
২. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র, সমাজকল্যাণ ও শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে লিখুন।

পাঠ ঃ ৫ মদীনা- ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- মহানবী (স)-এর বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারবেন;
- মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের বিধিবিধান সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

সুবিচার প্রতিষ্ঠাকে একটি রাষ্ট্রের মেরুদন্ড বলা যেতে পারে। ইসলাম স্বভাব ধর্ম হওয়ার কারণে সুবিচারের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। প্রিয় নবী (স) সুবিচারের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। ধনী-দরিদ্র, মুসলিম-অমুসলিম, বন্ধু-শত্রু সকলের জন্য তাঁর ইনসাফ ও সুবিচার ছিল সমান। পবিত্র কুরআনের বাণী-

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإِحْسَانِ

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন।" (সূরা আন-নাহাল : ৯০)

মহানবী (স) এর বিচার ব্যবস্থা

মহানবী (স) বিচারকার্য সুচারুভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।
মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের কা'যা বা বিচার বিভাগকে অত্যন্ত উন্নতমানের করে গড়ে তুলেছিলেন। আল্লাহর বাণী আল-কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী সমাজে ও রাষ্ট্রে ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারালয়কে উপযুক্তরূপে গড়ে তোলা হয়েছিল। নবী করীম (স) নিজে ছিলেন প্রধান বিচারক। এছাড়া বিচারকমন্ডলী নিয়োজিত ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বত্র। তারা তাঁদের সৎচরিত্র, ইসলামী শরীয়া, হুদুদ ও দন্ডবিধি সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান, উন্নত গুণাবলী, বিচার নৈপুণ্যের জন্যই বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হতেন।

নবী করীম (স) ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে এদিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। ঐশী প্রত্যাদেশ অনুযায়ী তিনি স্বয়ং ইনসাফ ও ন্যায়ের আধার ছিলেন। কেননা খোদায়ী বিধানের প্রধান ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারপতি। জানা যায়, সর্বোচ্চ বিচারক হিসেবে তিনি অসংখ্য মামলার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আল্লামা কাত্তানী তাঁর গ্রন্থের একটা পৃথক অধ্যায়ে রাসূল (স)-এর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ের বিচারকদের বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের মধ্যে আট জনের নাম উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা হলেন উমর, আলী, মু'আয ইবন জাবাল, আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, যায়দ ইবন সাবিত, আবূ মূসা আল-আশআরী, উকবাহ ও মা'কিল ইবন ইয়াসার।

এ প্রসঙ্গে এখানে এটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, নবী (স) -এর যুগে কা'যীদেরকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কাযী ও প্রাদেশিক কা'যী। হযরত আলী, মু'আয ও আবূ মূসা আল-আশআরীসহ অন্যান্য বিচারকরা ছিলেন প্রাদেশিক বা বিভাগীয় কাযী। তখনকার সময় আমীর, জাবী (কর সংগ্রহকারী) এবং আমিল শব্দ কয়টি একটির পরিবর্তে অপরটি ব্যবহার করা হতো। বস্তুত কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় সকল প্রশাসক বিচার বিভাগীয় ক্ষমতারও অধিকারী ছিলেন। কেননা সে যুগে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন দেখা দেয়নি এবং কাযীদেরকে সাধারু প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত করা হত। প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার প্রয়োজনও পড়েনি।

এছাড়া কতক ব্যক্তি নবী (স) -এর নির্দেশে অনেক সময় তাঁর উপস্থিতিতেও কা'যীর দায়িত্ব পালন করতেন। ইমাম তিরমিযী, আহমদ ইবন হাম্বল ও আল-হাকিম কর্তৃক লিপিবদ্ধ হাদীস থেকে জানা যায় যে, বিবদমান পক্ষগুলো নবী (স)-এর নিকট মামলা দায়ের করলে পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে তিনি হযরত উমর, মাকিল বিন ইয়াসার ও উকবাহকে বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের মামলার নিস্পত্তি করতে বলতেন। অবশ্যই এটি দ্বারা নবী (স) এর লক্ষ্য ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের ভবিষ্যত কাযী ও শাসকদের বাস্তব ধারুা ও প্রশিক্ষণ দেয়া এবং এমন একটি প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যেটা প্রশাসনের প্রাত্যহিক সমস্যাসমূহের মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়।

তবে পরবর্তী লেখকরা বর্ণনা করেছেন যে, বিরোধ নিস্পত্তির প্রশ্নে নবী (স) ব্যক্তিগত ভাবেই কাউকে না কাউকে দায়িত্ব দিয়েছেন এমন নয় বরং কখনো কখনো মামলার প্রকৃতি বিচার করে সামষ্টিকভাবে কয়েকজনের উপর বিচারের দায়িত্ব আরোপ করতেন।

মদীনা-ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগে পালনীয় বিধি বিধান

মদীনা ইসলামী-রাষ্ট্রের বিচার বিভাগে যে সব বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতি অনুসরু করা হত তা নিম্নরূপ-

আল্লাহ প্রদত্ত বিভিন্ন বিধানের অনুসরু

মহান আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধি-বিধান মোতাবেক বিচার ও ফয়সালার কাজ সম্পন্ন করা আবশ্যক ছিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ.

''আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা কাফের।'' (সূরা আল-মায়েদা : ৪৪)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, একবার হযরত আনাস ইবন মালিক (রা)এর নিকট আত্মীয় রবি' বিনতে নজরের হাতে একজন আনসারী মেয়ের দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। মেয়েটির পরিবারের লোকেরা মহানবী (সা.) -এর দরবারে বিচারপ্রার্থী হলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (স) মহান আল্লাহর বাণী وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ "দাঁতের বিনিময়ে দাঁত" (সূরা আল-মায়েদা : ৪৫)) অনুসারেই রায় প্রদান করলেন।

যে সব সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য

বিচার কার্যে কারো সুপারিশ অগ্রহণীয় ছিল। মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারবিভাগ ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। বাদী-বিবাদী কারো পক্ষে কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য ছিল না। বিচারকগণ সম্পূর্ণভাবে প্রভাবমুক্ত ছিল।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, পবিত্র মক্কা বিজয়ের সময় মাখজুমী গোত্রের ফাতেমা নামক একজন মহিলা চুরিতে ধরা পড়ল। এ গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স) -এর অত্যন্ত প্রিয় সাহাবী হযরত উসামা বিন জায়েদ (রা)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আপনি ফাতেমা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট একটু সুপারিশ করুন যেন তিনি ফাতেমার বিচার একটু সহজ করেন।

হযরত উসামা (রা) এরূপ সুপারিশ করার পর হযরত রাসূল (স) রাগ করে বললেন ঃ "উসামা ! তুমি আমার নিকট স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বিধান পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করছ?" হযরত উসামা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে ক্ষমা করুন।"

অনুমানের ভিত্তিতে রায়প্রদান নিষিদ্ধ

পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে অনুমানের ভিত্তিতে রায় প্রদান করা হত না। বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে ঃ একবার হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর একজন অত্যন্ত প্রিয় সাহাবী, হযরত আবদুল্লাহ ইবন সহলকে তার চাচাত ভাই মোহাইসা' (রাঃ) সহ খায়বারের খেজুর পরিমাপ করার জন্য প্রেরু করেন। হযরত আবদুল্লাহ একজন আততায়ীর হাতে রাস্তায় শহীদ হন। হযরত মোহায়সা তখন হযরত আবদুল্লাহর নিকট ছিলেন না। হযরত আবদুল্লাহর হত্যাকারী কোন ইয়াহূদীই হবে, কেননা এলাকাটি ছিল ইয়াহূদীদের, আর তারা ছিল মুসলমানদের চরম শত্রু তাই এ হীন কাজ হয়তো তাদের দ্বারাই হয়েছে।

কিন্তু হত্যাকারী কে ? নিদিষ্টভাবে তা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। এজন্য মোহাইসা (রা) বিচার দায়েরের পর হযরত মুহাম্মদ (স) তাকে বললেন ঃ তুমি কি শপথ করে বলতে পার যে, এ ঘটনা ইয়াহূদীদের দ্বারাই ঘটেছে ?

স্বজন প্রীতি থেকে মুক্ত হয়ে বিচার কার্য পরিচালনা

মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল-

এতে স্বজন-প্রীতির বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। যদি সত্যকে তুলে ধরার জন্য স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তাতেও দ্বিধা করার কোন অনুমতি নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ

''হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।" (সূরা আন-নিস-১৩৫)

কোন কোন সময়ে স্নেহ ভালবাসা, মায়া-মমতা অথবা কারো ভয়-ভীতি মানুষকে ন্যায়বিচারের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এই জন্যই পবিত্র কুরআনে আত্মীয়তা ও স্বজনপ্রিয়তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে কোন রকম রায় না করার তাগিদ করা হয়েছে। কেননা, এমন অবস্থায় ন্যায়বিচারের আশা সুদূরপরাহত।

একবার জনৈক ইহুদী একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে মামলা দায়ের করল। প্রিয়নবী (স) সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে সেই ইয়াহূদীর পক্ষে রায় দিয়ে সুবিচারের এক মহান আদর্শ পেশ করেন।

আঞ্চলিকতা ও দলীয় প্রভাবমুক্ত হওয়া

মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার কার্য সম্পূর্ণভাবে আঞ্চলিকতা প্রভাব মুক্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) এরশাদ করেছেন ঃ "যারা আঞ্চলিকতার প্ররোচনা দিবে তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।" (আবু দাউদ)

একবার হযরত ওয়াসেলা ইবন আসকা জানতে চাইলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আঞ্চলিকতা কী ? জবাবে তিনি বলেন, অন্যায়ভাবে স্বগোত্রীয়দের সাহায্য ও পক্ষ সমর্থন করা।" (আবু দাউদ)

হযরত রাসূলে করীম (স)-এর পুত:পবিত্র জীবনে কতগুলো ঘটনা এমন ঘটেছে যে, তাঁর দরবারে মামলা বিচারের জন্য দায়ের করা হল। আর বাদী বিবাদীর মধ্যে এক পক্ষ মুসলিম আরেক পক্ষ অমুসলিম। রাসূলুল্লাহ (স) সাক্ষী গ্রহণের পর অমুসলিম ব্যক্তির পক্ষে রায় প্রদান করেন।

দলীয় লোকের ভালবাসা তাঁকে ন্যায়বিচার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি।

প্রিয়নবী (স) দূর বা নিকট সকলের প্রতি সমভাবে বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقيموا حدود الله على القريب و البعيد

"উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী (স) এরশাদ করেছেন: "আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি জারী কর এবং তাতে দূর ও নিকটের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য কর না।''

বিচারব্যবস্থায় দীর্ঘসুত্রিতা পরিহার

মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার ব্যবস্থা দীর্ঘসুত্রিতা পরিহার করা হত। যাতে করে অত্যাচারিতের প্রতি সঠিক ও যথাযথ ও সময়মত সহযোগিতা দেখানো সম্ভব হয়। তাই কোন মামলা দায়ের করা হলেই মহানবী (স) সঙ্গে সঙ্গে মিমাংসা করে দিতেন মুসলিম শরীফে আবু হায়দারের ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। মহানবী (স) কাছে রাস্তায় বা মসজিদে বা যে কোন জায়গায় বিচার চাওয়া হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঐস্থানে বসেই বিচার কার্য সম্পাদন করে ফেলতেন।

ইমাম বুখারী, বুখারী শরীফের আহকাম অধ্যায় এ সম্পর্কে পৃথক পৃথক পরিচেছদ রচনা করেছেন। বিচার ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে যেভাবে দীর্ঘ সুত্রিতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয় মহানবী (স) এই দীর্ঘসূত্রিতা বা বিলম্বকে আদৌ রবদাশত করতেন না।

বিচারপ্রার্থীকে কোন অর্থ ব্যয় করতে হত নাঃ এই বিচার-ব্যবস্থার আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল বিচার লাভের জন্য ফরিয়াদীকে কোন অর্থ-সম্পদও ব্যয় করতে হত না। কেননা, যে মজলুম, তার হক বা অধিকারই হল বিচার পাওয়া। এই সম্পর্কে প্রিয়নবী (স) সতর্ক বাণী উচ্চারু করে বলেছেন ঃ

دعوة المظلوم مستجابة و إن كان فاجرا

"মজলুমের ফরিয়াদ অবশ্যই গৃহীত, যদিও সে পাপী হয়।"

বাদী-বিবাদী উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টি প্রদান

মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার ব্যবস্থা এমন ছিল যে, বিচার চলাকালীন সময়ে বিচারক বাদী বিবাদী উভয়ের সঙ্গে সর্ববিষয়ে সমান ব্যবহার করতেন। উভয় পক্ষকে সমান মর্যাদা দেওয়া হত, সমভাবে আলাপ আলোচনা করা হত।

মহানবী (স) শুধু এক পক্ষের কথা শুনেই মতামত দিতেন না। তিনি বলেছেন-

إن لصاحب الحق مقالا

''অধিকারীর তথা বাদীর কিছু বলার অধিকার রয়েছে।'' (মুসলিম)

যোগ্য, অভিজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ন বিচারক নিয়োগ

মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার সঠিক পরিচালনার জন্য মহানবী (স) ন্যায়পরায়ণ যোগ্য, অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করতেন। এ পাঠের শুরুতে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের কাছে যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

সত্য সাক্ষ্য নিশ্চিত করা

বিচার কার্য পরিচালনায় মহানবী (স) সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন তবে তিনি সাক্ষ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। সত্য সাক্ষ্যের গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন-

والله لا أشهد على جور

''আল্লাহর শপথ আমি অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দেব না।'' (মুসলিম)
মিথ্যা সাক্ষ্যকে তিনি বলেন,

ألا وشهادة الزور

"সাবধান! মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান মহাপাপ।" (বুখারী)

বিচারককে রাগন্বিত অবস্থায় রায় দেয়া নিষেধ-
বিচারকগণ স্বাভাবিক অবস্থায় রায় প্রদান করতেন, রাগান্বিত অবস্থায় রায় প্রদান অগ্রহণযোগ্য ছিল। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স)-এর বাণী-

لايحكم الحاكم وهوغضان.

''বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় রায় প্রদান না করে।'' (বুখারী)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বিচারক ছিলেন-
ক. হযরত আবু বকর (রা); খ. হযরত উমর (রা);
গ. হযরত আলী. (রা); ঘ. হযরত মুহাম্মদ (স)।

২. হযরত আবু মূসা আল-আশআরী ছিলেন-
ক. কেন্দ্রীয় বিচারপতি; খ. প্রাদেশিক বিচারপতি;
গ. স্থানীয় বিচারপতি; ঘ. মদীনার বিচারপতি।

৩. মহানবী (স)-এর যুগে প্রশাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ-
ক. পৃথক ছিল; খ. এক সঙ্গে ছিল;
গ. সাময়িকভাবে একসঙ্গে ছিল; ঘ. কোন উত্তরই সঠিক নয়।

৪. মহানবী (স) -এর রাষ্ট্রের বিচারকার্য পরিচালনা হত-
ক. কুরআনের বিধি মোতাবেক; খ. মানব রচিত আইন মোতাবেক;
গ. বিচারকের ইচছা মোতাবেক; ঘ. উকিলদের পরামর্শ মোতাবেক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. মহানবী (স)-এর বিচারব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারকার্যে যে সব বিধি-বিধান মেনে চলা হত তার উল্লেখযোগ্য ৫টি বর্ণনা দিন।
৩. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারকার্যে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করা হত-আলোচনা করুন।
৪. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারকার্য দলীয় ও আঞ্চলিক প্রভাব মুক্ত ছিল- ব্যাখ্যা করুন।
৫. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারকার্যে সুপারিশ গ্রহণ করা হত না- আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
২. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার কার্যে কোন প্রকার যে সব বিধি-বিধান মেনে চলা হত তার বর্ণনা দিন।

মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ

পাঠ ঃ ৬

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সেনা বিভাগের অপরিহার্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর কাঠামো সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর বিন্যাস সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- শিবির অধিনায়ক ও সৈন্য গণনা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আশ্বারোহী বাহিনী সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক বিভাগের প্রয়োজনীয়তা

যে কোন রাষ্ট্রের জন্য একটি সুসংগঠিত, সেনাবাহিনী থাকা অপরিহার্য বিষয়। মহানবী (স) -এর মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রেও-এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করা হয় নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলঃ

মদীনায় একটি নতুন সামরিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে একটি সামরিক সংগঠনের ব্যবস্থাপনার বিষয়টিও অপরিহার্যরূপে এসে যায়। মদীনার দুর্বল ও সংখ্যার দিকে নিতান্তই স্বল্প মুসলিম সম্প্রদায় হিজরতের পর প্রকৃত পক্ষে এমন একটি ভূখণ্ডে বাস করতে থাকে যার চারদিকে ঘিরে ছিল একটি প্রবল বিরোধী শত্রু পক্ষ। মদীনার মুসলমানদের সামনে যে বড় বিপদ দেখা দেয় সেটি ছিল মক্কাবাসীদের তরফ থেকে প্রতিনিয়ত একটি আক্রমণের আশংকা। কারু, মহানবী (স) ও তাঁর সাহাবীগণ মক্কার কাফিরদের রুদ্ররোষের কারণে মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত চলে আসেন। এমনকি এখানে নতুন আবাসস্থলেও মুসলমানদের শত্রুর শেষ ছিল না। এই নগরীর ইয়াহূদীরা মহানবী (স) ও তাঁর ধর্মবিশ্বাসের বিরোধিতা করাকেই বেছে নেয়। আর এটা মুসলমানদের অস্তিত্বের উপর একটি নয়া হুমকি সৃষ্টি করে। মুনাফিকদের শত্রুতাও তাদের জীবনকে করে তুলে আরো দুর্বিসহ। এই দু'টি অভ্যন্তরীন বৈরিতা ছাড়াও এলাকার পৌত্তলিক আরব উপজাতিগুলো তাদের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এসব বহুবিধ হুমকি ও বিপদের মুখে মদীনার শিশু ইসলামী রাষ্ট্রকে তার সামরিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হয়। অন্যথায় তার অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সমূহ আশংকা ছিল।

বিধর্মী শত্রু পরিবেষ্টিত পরিমন্ডলে মুহাম্মদ (স) মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা ও সংহতির জন্য স্থায়ী প্রতিরক্ষা বাহিনী (আর্মি) গড়ে তুলেছিলেন। তিনি এক দশকের মধ্যেই ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক সংগঠনকে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে, বিশ্ববাসী অতি উন্নত এক সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখতে পেয়েছিল। সময়ের প্রয়োজন ও সামরিক প্রতিরক্ষা ও রুকৌশল বিবেচনায় রেখে তিনি সামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ দিতেন।

সেনাবাহিনীর অবকাঠামো

মহানবী (স) তাঁর সেনাবাহিনীর জন্য একটি চমৎবকার ও আধুনিক অবকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন, তাঁর সেনাবাহিনীর কাঠামোর মধ্যে ছিলঃ

- সেনানায়কবৃন্দ (উমারা আল-সারিয়া),
- সামরিক কর্মকর্তাগণ (উমারা আল মায়মানাহ, মায়সারাহ, মুকাদ্দামাহ ও সাকাহ),
- পতাকাবাহী (সাহিব আল লিওয়া ওয়া'আর-রায়াহ),
- স্কাউট (তালিআহ),
- গুপ্তচর (উয়ূন),
- পথ প্রদর্শক (দালীল)
- যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ ও যুদ্ধবন্দীদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (আসহাবু'ল মাগানিম ওয়া'ল উসারা),
- যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের অর্শ্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (আসহাবু'স সিলাহ ওয়া'ল ফারাস)
- দেহরক্ষীগণ (আসহাবু'ল হারাস)।

ইসলামী সেনা বাহিনীর বিন্যাস

মহানবী (স) তাঁর যুদ্ধকালে সেনা পরিচালনায় অনেক সময় "আল-খামিস" পদ্ধতি অনুসরু করে সেনাবাহিনীকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো ছিল-

- কালব (কেন্দ্রীয় বাহিনী),
- মায়মানাহ (দক্ষিণবাহু),
- মায়সারাহ (বামবাহু),
- মুকাদ্দামাহ (অগ্রবর্তী বাহিনী)
- সাকাহ (পশ্চাদরক্ষী)।

নবী করীম (স) তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনার জীবনে ৮০টি যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। 'গাজওয়াত' বা বড় যুদ্ধ যাতে তিনি নিজে সেনাপতি হিসেবে অংশ নিয়েছেন এমন যুদ্ধের সংখ্যা ২৭টি। এছাড়া অন্যগুলো ছিল 'সারায়া'। সেগুলোতে তিনি সাহাবী ও সেনাধ্যক্ষদের অভিযান পরিচালচনায় নেতৃত্ব দিয়ে (আমীর আল-আসকার বা সেনাপতি নিযুক্ত করে) পাঠিয়েছেন। তিনি কনভেশনাল ফ্রন্টাল ওয়ার, গেরিলা ওয়ার, সাইকোলজিক্যাল ওয়ার, সব কৌশলই প্রয়োজন মত ব্যবহার করেছেন। ট্রেঞ্চ খোঁড়া, আক্রমণ ও পশ্চাদপসরু সব পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন। ঈমানের বলে বলীয়ান সুশংঙ্খল ইসলামী সেনাবাহিনীর বিন্যাস, পরিচালনা পদ্ধতি ও রুকৌশল এমন উন্নতভাবে গৃহীত হত যে, একের পর এক বিজয় মুসলমানরা পেয়েছিল। বদরের যুদ্ধে আল্লাহর অশেষ কৃপায় মাত্র ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ শুরু হয়। এভাবে মক্কা থেকে হিজরতের মাত্র ৮ বছরের মধ্যেই ফতহে মক্কা বা মক্কা বিজয় সম্ভব হয়। এছাড়া পুরো আরব উপদ্বীপকে মুসলিম বাহিনী বিজয়ের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে মদীনা কেন্দ্রিক ইসলামী রাষ্ট্রের আওতায় আনতে সক্ষম হয়। কুফর ও খোদাদ্রোহীদের পরাজয় এবং তৌহিদের বিজয় সুচিত হয়।

আল-হারাস

বৈরিতার সময় ইসলামী সেনাবাহিনী তার বিরুদ্ধে উত্থিত চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য রাজধানীর বাইরে চলে গেলেও রাজধানীতে একটি সেনা গ্যারিসন মোতায়েন থাকত, যাতে সেনাবাহিনীর অবর্তমানে আশপাশের কোন বৈরী গোত্রের হামলার বিরুদ্ধে রাজধানীর মুসলমানরা আত্মরক্ষা, প্রতিশোধ বা পাল্টা আক্রমণ চালাতে পারত। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও মদীনার মুসলমানগণ নিজেদের খুব একটা নিরাপদ ভাবতে পারত না। কারু, স্বার্থ লোভী মুনাফিক ও ইয়াহূদী গোত্রের শাখাগুলো রাজধানী শহরের বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য শক্তি সঞ্চয়ে ব্যস্ত থাকত। এমতাবস্থায় সদর দফতরের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে অধিক মনোযোগ প্রদান ও প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। মহানবী (স) যখনই রাজধানীর বাইরে যেতেন, তার অনুপস্থিতিতে মদীনার উপর বাইরের হামলা প্রতিরোধ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনের উপযোগী একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী রেখে যেতেন। এমন কি তাঁর মদীনায় অবস্থানকালেও বাইরের কোন মারাত্মক হামলা মোকাবেলায় তিনি এ কর্তব্য পালনে সচেতন থাকতেন।

সেনাবাহিনীর অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগসমূহ

এ ছাড়া সেনা শৃঙ্খলার জন্য ছাউনি ও শিবির অধিনায়ক, নৈশ প্রহরা, সৈন্য গণনা, প্রশিক্ষণ, জনবল বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যবস্থা রেখেছিলেন। মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী আরও যে সকল বিভাগে বিভক্ত ছিল তা হলঃ

- ইনফেন্ট্রি বা পদাতিক (মুশাত)
- ক্যাভেলরী বা অশ্বরোহী (আল-খায়ল),
- তীরন্দাজ (রুমাত),
- বর্মধারী সৈন্য (আহলু'ল সিলাহ) এবং
- সাপ্লাই কোর বা রসদবাহী।

কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনী ছাড়া প্রাদেশিক সামরিক সংক্রান্ত প্রশাসন প্রাদেশিক গভর্ণরের অধীনে 'বিলায়াত' ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হত। রাসূল (স) ইসলামী সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখায় গোত্রীয় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতেন। ইসলামী রাষ্ট্রের অস্ত্র ভান্ডারকে ক্রমাগত যুদ্ধ বিজয়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা হয়েছিল। সেগুলোর দায়িত্বে থাকতেন নির্দিষ্ট সামরিক কর্মকর্তাগণ। এছাড়া সামরিক অভিযানকালে দেহরক্ষী প্রথাও চালু করেছিলেন তিনি।

অশ্বারোহী বাহিনীর ক্রমান্বয় অগ্রগতি

পদাতিক বাহিনীই ছিল সেনাবাহিনীর মূল অংশ। পরবর্তীকালে অশ্বারোহী বাহিনী প্রচলনের ফলে তাদের প্রধান্য হ্রাস পায়।

মহানবী (স)-এর প্রধান অভিযানসমূহে ব্যবহৃত অশ্ব ও অশ্বারোহীর সংখ্যার একটি পর্যালোচনা এখানে উল্লেখের দাবি রাখে। কারু এ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের অশ্বারোহী বাহিনীর শক্তির ক্রম বিকাশের পরিচয় পাওয়া যাবে। বস্তুত অশ্বরোহী বাহিনী ক্রমান্বয়ে বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ২ হিজরীতে (৬২৪ খৃষ্টাব্দ) অনুষ্ঠিত প্রথম খন্ড যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মাত্র ২টি অশ্ব ছিল। পক্ষান্তরে প্রতিদ্বন্দ্বী মক্কার বাহিনীর ছিল ১০০টি। ৬ মাস পর কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে মুসলিম বাহিনীর হাতে মাত্র কয়েকটি অশ্ব ছিল। ৩ হিজরীর শাওয়াল মাসে (৬২৫ খৃষ্টাব্দে মার্চ) মদীনার মুসলিম বাহিনীতে ছিল মাত্র ৫০টি অশ্ব অথচ কুরায়শ বাহিনীতে ছিল ৩ হাজার সৈন্য, ২শ অশ্ব। মুরায়সী অভিযানকালে মুসলিম অশ্বারোহী সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০ জন। কিন্তু ৫ম হিজরীর (৬২৭ খৃষ্টাব্দ) যিলকদ মাসে খন্দক অভিযানকালে মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর সংখ্যা ৫০০তে পৌঁছেছিল। ৩০০ ও ২০০, এ দু'টি দলে বিভক্ত এ বাহিনীকে মদীনা রক্ষার জন্যে নিয়োজিত করা হয়েছিল।

শিবির অধিনায়কগণ

সাধারুত ইসলামী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তার শিবিরেরও অধিনায়ক ছিলেন। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে শিবিরের জন্যে স্বতন্ত্র অধিনায়কও নিয়োগ করা হত। ওয়াকিদী সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে হাশিম গোত্রের হযরত আলী এবং উমাইয়া গোত্রের হযরত উসমান ইবন আফফান বনূ নাযীর ও খায়বার অভিযানকালে মুসলিম শিবিরের অধিনায়ক ছিলেন। মহানবী (স) তাঁর অনুপস্থিতিতে তাদেরকে ইসলামী বাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার পদে নিয়োগ করেছিলেন। খায়বার অভিযানকালে মহানবী (স) শিবির থেকে দূরে অবস্থানকালে উমাইয়া গোত্রের হযরত উসমান ইবন আফফান (রা) কে তার ডেপুটি এবং তার সাথে সাথে শিবিরেরও অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন।

সৈন্য গণনা

মহানবী (স) এর সামরিক সংগঠনের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সেনা সমাবেশ (আরয)। সেনা সমাবেশের দায়িত্ব বিশেষভাবে অভিজ্ঞ সাহাবীদের উপরই তিনি অপর্ণ করতেন। সাধারুত স্থায়ী সেনাবাহিনী না থাকার কারণে সৈন্য সংগ্রহ করার সাথে সাথেই তাদের সমাবেশ ও গণনার ব্যবস্থা করা হতো। কোন কোন সময় সৈন্যদের অভিযানে যাওয়ার আগে অথবা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পূর্বেও সংগ্রহকৃত সৈন্যের গণনা কাজ সমাধা করা হত। এটা নিশ্চিত যে মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ থেকেই সেনা সংগ্রহ ও গণননার ব্যাপারটি চালু হয়।

পরিশেষে বলা যায়, মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষনে জন্য সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মহানবী (স)-এর অবকাঠামো গড়ে তোলা ও বিন্যাসের মাধ্যমে সে প্রয়োজনীয়তা পূরণে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হন। তিনি সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে এক অনন্য সাধারু সামরিক ব্যবস্থাপনার নজীর রেখে যান, যা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে এবং যুগযুগ ধরে এ আদর্শ অনুকরু যোগ্য হয়ে থাকবে।

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে মুসলমানগণ যে সব বড় বড় বিপদের আশঙ্কায় ছিলেন এদের একটি হল-

ক. অভাব অনটনের আশঙ্কা; খ. আওস ও খাযরাজের অসহযোগিতা;
গ. মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে আক্রমণ; ঘ. মুনাফিকদের পক্ষ থেকে আক্রমণ।

২. মুসলিম সেনাবাহিনীর ঈমানী শক্তির সঙ্গে তাদের বিজয়ে আরও যে বিষয়গুলো সহযোগিতা করে তা হল-

ক. সেনা বাহিনীর বিন্যাস; খ. পরিচালনা পদ্ধতি;
গ. রুকৌশল; ঘ. সব উত্তরই ঠিক।

৩. মহানবী (স) সর্বমোট ৮০টি যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এর মধ্যে তিনি স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন-

ক. ২৫টিতে; খ. সবক'টিতে;
গ. ২৭টিতে; ঘ. একটিতেও না।

৪. ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম খন্ড যুদ্ধে মুসলমানদের অশ্বারোহী সৈন্য সংখ্যা ছিল-

ক. ২ জন; খ. ৫০ জন;
গ. ৫০০ জন; ঘ. ৩০ জন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সেনা বাহিনীর অবকাঠামো সম্পর্কে লিখুন।
৩. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সেনা বাহিনীর বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের আর্শ্বারোহী বাহিনীর উপর সংক্ষিপ্ত একটি টিকা লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।